মূর্তিপূজার রহস্য

মূর্তিপূজা বিষয়ক সকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর

এই গ্রন্থে আপনি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন

- ভগবানের রূপ কি ভগবানকে সীমিত করে না?
- ভগবান বা দেবদেবীগণের রূপ কাল্পনিক নয় কি?
- ন তস্য প্রতিমা অস্তি— তাহলে, শাস্ত্রে কী মূর্তিপূজার বিধান নেই?
- মূর্তিতে কি ভগবান অবস্থান করতে পারেন?
- ভাস্কর্য ও অর্চাবিগ্রহের পার্থক্য কী?
- বিগ্রহ কি আদৌ নৈবেদ্য গ্রহণ করেন?
- বিগ্রহের সম্মুখে অপসংস্কৃতির চর্চা বন্ধে কী করণীয়?
- আরতি কেন করা হয়?
- মূর্তি বিসর্জন কেন করা হয়?
- বর্তমানে পশুবলি কতটা শাস্ত্রীয়?
- ভগবান ও দেবদেবীর সম্পর্ক কী?

—এছাড়াও আরো বহু প্রশ্নের উত্তর

৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০
e-mail: arsandhane@gmail.com

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মূর্তিপূজার রহস্য

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য:
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-
এর শিক্ষার আলোকে রচিত ও সংকলিত

(মিলন)

০৬/১১/২২
প্রকাশককে প্রদান
করা হইল।

মূর্তিপূজার রহস্য

(Secret of Deity Worship)

প্রকাশক

শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

রচনা ও সংকলন

প্রণয় কুমার পাল | শুভাশীষ দত্ত

বিবিএ, এমবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | বিএফএ, এমএফএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

ক্ষণিকা গোপ

সহকারী অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পি এইচ ডি গবেষক, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা

প্রথম প্রকাশ– দুর্গাপূজা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম সংস্করণ– সরস্বতী পূজা '১৮

দ্বিতীয় সংস্করণ– দুর্গাপূজা '১৮

তৃতীয় সংস্করণ– দুর্গাপূজা '১৯

প্রচার মূল্য: ৪০ টাকা

প্রকাশনায়

অমৃতের সন্ধানে প্রকাশন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, ইসকন

৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম; ঢাকা, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭৩৩২০৮৭০৬, ০১৭৪৪৯৪৩৮৪৪

ইমেইল : arsandhane@gmail.com

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

করকমলে

যিনি বৈদিক তত্ত্বদর্শনকে যুক্তিযুক্তভাবে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করে

সমগ্র বিশ্বে পারমার্থিক বিপ্লব সাধন করেছেন।

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মূর্তিপূজক, পৌত্তলিক আখ্যা বহুকাল ধরেই অনেকেই দিয়ে এসেছে এবং এ নিয়ে অনেক প্রশ্নেরও অবতারণা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সবার জানা দরকার– সত্যিই কি তারা পুতুল বা মূর্তিরই পূজা করে? নাকি এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রহস্য আছে? এ বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা হলে সনাতন ধর্মের যথার্থ মর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো বেশিরভাগ সনাতন ধর্মাবলম্বীই তার কোনো যথার্থ উত্তর দিতে পারে না; জানেও না। অথচ, বছরের পর বছর ধরে তারা প্রথাগত এ ধর্মীয় আচার অন্ধের মতো অনুসরণ করে আসছে। এ কারণে বর্তমান সমাজে পূজা বা ধর্মীয় উৎসবগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সনাতনী সংস্কৃতি ও ভাবধারা থেকে সরে গিয়ে আচারসর্বস্বতা ও অ সংস্কৃতির দ্বারা কলুষিত হয়ে গেছে। সেজন্য বৈদিক সনাতন সংস্কৃতির মতো মর্যাদাসম্পন্ন সংস্কৃতিও আজ অন্য ধর্মাবলম্বীদের পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক আগেই এ বিষয়টি আমাদের নজরে এলেও সম্প্রতি আমাদের মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় আমরা এ বিষয়টির উপর কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আরো ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে মূর্তিপূজার যথার্থ তত্ত্ব তুলে ধরার জন্য আমরা এ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি, যার মাধ্যমে মূর্তিপূজার নামে যে অপসংস্কৃতি ও আচারসর্বস্বতার চর্চা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে মানুষ জানবে এবং সচেতন হয়ে যথার্থভাবে পূজা সম্পাদন করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে।

প্রকাশনায় ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে গ্রন্থের সারবস্তু গ্রহণ করার জন্য সুধী পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ রইল।

বিনীত
–প্রকাশক

প্রসঙ্গ কথা

সনাতন ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীন ধর্ম। বস্তুত, এই ধর্মের দর্শন এই অর্থে প্রাচীন যে, তা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই জীব ধারণ করে আসছে। ধর্মীয় দর্শনের পাশাপাশি এর আচার-আচরণ ও রীতিনীতিও বহু প্রাচীন। এর নিদর্শনও পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈদিক দেবদেবীদের মূর্তি বা বিগ্রহের সন্ধান মিলছে। তার অর্থ এই যে, বহুকাল আগে থেকেই বিগ্রহরূপে ভগবান বা দেবদেবীগণেরর আরাধনা প্রচলিত আছে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে মানুষের যুক্তিবাদী মন স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধান করে– ভগবান বা দেবদেবীগণের বিগ্রহরূপে আরাধনার পেছনে কী কারণ? কেনই বা একটি জড় মূর্তি বা বিগ্রহকে এত সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়? এর পেছনে কি আধ্যাত্মিক দর্শন রয়েছে? নাকি এগুলো কেবলই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা লৌকিক প্রথা মাত্র? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন সময়ের দাবি, এগুলোকে এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। এই সংশয়ের সমাধান দিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ শিক্ষার্থী এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করে। তাদের গবেষণা ও আধুনিক যুক্তিবাদী মনের খোড়াকরূপে ২০১৭ সালে 'মূর্তিপূজার রহস্য' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালে আরেকটু বর্ধিত কলেবরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর থেকে যুবসমাজ তথা শিক্ষার্থীদের মাঝে গ্রন্থটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, বিভিন্ন মহলে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ'র সহকারী অধ্যাপক ক্ষণিকা গোপ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে তাঁরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এতো চমৎকার একটি গ্রন্থ উপহার দিতে পেরেছে বলে আমি আনন্দিত। আশা করি, এই গ্রন্থটি পাঠকমহলকে পরমেশ্বর ভগবান বা দেবদেবীগণের বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দান করবে এবং বহু সংশয়ের যুক্তিপূর্ণ সমাধান দিবে।

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার
সাবেক চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ ও সিনেট সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপক্রমণিকা

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকেরই অজানা

আবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের ছাত্র। এ বছর প্রথম বারের মতো সে জগন্নাথ হলে দুর্গাপূজা দেখবে। জগন্নাথ হল মানে হিন্দু সংস্কৃতি চর্চার এক সুবৃহৎ চারণভূমি। সারা বাংলাদেশের অসংখ্য হিন্দু মেধাবী তরুণ ছাত্রের মিলনমেলা এ জগন্নাথ হল। সে সূত্রে বলা যায়, হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এ জগন্নাথ হল। আবির এ হলেরই আবাসিক ছাত্র হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সুবিশাল পরিসরে হলে পূজার আয়োজন দেখে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে ছিল সংস্কৃতিমনা, তাই পূজার বিভিন্ন আয়োজনে তার অংশগ্রহণও ছিল লক্ষণীয়। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সে তার ক্লাসের বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ দিল পূজায় আসার জন্য। সে যখন তার ক্লাসে বন্ধুদের পূজোর নিমন্ত্রণ দিচ্ছিল, তখন তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করল–

বন্ধু: আচ্ছা আবির, কিছুদিন পরেই তো তোমাদের পূজা। তোমার কাছে আমার এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল।
আবির: হ্যাঁ, বল না কী প্রশ্ন।
বন্ধু: তোমরা যে প্রতিমা বা মূর্তি তৈরি করে পূজা করো, তা তো কেবল মাটি, খর, পাথর, কাঠ বা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এরকম একটা মূর্তিকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পূজা করার বিষয়টি আমার কাছে নিরর্থক ও মনগড়া বলে মনে হয়।
আবির: দেখ, এটা আমাদের ধর্মবিশ্বাস; আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এভাবেই পূজা করে এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিগ্রহ বা মূর্তির মধ্যে ভগবান বা দেবদেবীগণ অবস্থান করে পূজা গ্রহণ করেন।
বন্ধু: বিশ্বাস, নাকি অন্ধবিশ্বাস? আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এমন কুসংস্কারকে তোমরা এখনো আঁকড়ে ধরে আছো!

○ তোমরা যেসকল মূর্তি তৈরি করছো তা কাল্পনিক রূপ ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার কোনো রূপ নেই। তিনি নিরাকার। যদি অসীম সৃষ্টিকর্তার রূপ বা ব্যক্তিত্ব থাকে; তবে তিনি কি সীমাবদ্ধ হয়ে যান না?

○ যার রূপই নেই, তার আবার মূর্তি বা প্রতিকৃতি কীভাবে হতে পারে?

○ সৃষ্টিকর্তা সকলকে সৃষ্টি করেন, তাকে কীভাবে সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে?

○ তাছাড়া তোমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদেই তো বলা হয়েছে- *ন তস্য প্রতিমা অস্তি*। তাঁর কোনো প্রতিমা নেই, তবে তোমরা কীভাবে তার প্রতিমা তৈরি করে পূজা করছো?

○ তোমরা যে মূর্তির সামনে খাবার দাও, তা কি মূর্তি গ্রহণ করে?

○ একটা বিষয় একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ; যদি মূর্তিতে সৃষ্টিকর্তা থাকেনই, তবে যে মূর্তিকে কয়েকদিন পূজা করো, সেই মূর্তিকেই আবার জলে ভাসিয়ে দাও কীভাবে?

○ এ তো গেল মূর্তিপূজার দার্শনিক অযৌক্তিকতা। আর যদি ধরে নিই, মূর্তিতে ভগবান আছেন, তবুও আমার প্রশ্ন– তোমরা কি মূর্তিকে ভগবান হিসেবে যথাযথ সম্মান করছো?

- বেশিরভাগ পূজা মণ্ডপেই আধুনিক সিনেমার গান চালিয়ে অশালীন ভঙ্গিমায় নৃত্য করা হয়।
- মদ, গাঁজা বা ভাঙ খেয়ে নেশায় মাতলামি করা হয়। এটা কী করে কোনো ধর্মীয় আদর্শ হয়?

তাই আবির, আমার মনে হয় আধুনিক শিক্ষিত যুবক হিসেবে তোমার এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে সত্যের অনুসন্ধান করা উচিত। আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বই ও কিছু ওয়েবসাইট লিংক দিচ্ছি, তাতে তোমার ধারণা আরো স্পষ্ট হবে।

বন্ধুর কথা শুনে আবির চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। তার এতদিনের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আজ কয়েকটি প্রশ্নের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। তার বন্ধুর এ সকল প্রশ্নে মৌনতাই ছিল তার একমাত্র উত্তর। তারপর হলে এসে তার বন্ধুর দেয়া লিংকগুলো ভিজিট করে মূর্তিপূজার ভ্রান্তি বিষয়ে আরো কিছু লেকচার শোনে, যার দ্বারা সে খুব

প্রভাবিত হয়। তখন সে তার অপর এক বন্ধুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু তার সে বন্ধুটি আবিরের যুক্তিতে বিভ্রান্ত হয়নি, সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মোটামুটি জানাশোনা আছে এবং মন্দিরের বিভিন্ন পণ্ডিতের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। আবিরের সন্দেহ দেখে সে তাকে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানার জন্য নিকটস্থ মন্দিরের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেয়।

আবির ও তার বন্ধু একটি নির্দিষ্ট দিনে মন্দিরে এলো। ইতোমধ্যে মূর্তিপূজা বিষয়ক অনেকগুলো বই সে সংগ্রহ করেছে। আবির এখন সম্পূর্ণ মূর্তিপূজার বিরোধী। বিগ্রহ তার কাছে এখন জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবানের রূপেও সে বিশ্বাস করে না। তার কাছে ভগবান মানে নিরাকার নির্বিশেষ। তাই মন্দিরে প্রবেশ করে তার বন্ধু ভগবানের বিগ্রহে প্রণাম করলেও আবির তা করেনি। সে লক্ষ্য করছে বহু ভক্ত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আকুতিভরে প্রার্থনা করছে, কেউবা ভগবানের নাম জপ করছে, কেউ মন্দির পরিক্রমা করছে। পূজারী গর্ভমন্দিরে ভগবানকে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করছেন। আবিরের কাছে সবকিছু ছেলেখেলা মনে হচ্ছে। মূলমন্দিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তারা মন্দিরের ভেতর স্বামীজির অতিথি কক্ষে গিয়ে বসে। স্বামিজী অতিথি কক্ষে প্রবেশ করেন।

[স্বামিজী এই মন্দিরের অধ্যক্ষ। তাঁর পুরো নাম শ্রীধর চৈতন্য স্বামী। জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সাইন্স বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ছিল। তখন থেকেই তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করেন ও সাথে সাথে ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন। পরবর্তীকালে তিনি জগতের মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে বৈদিক দর্শন প্রচারের লক্ষ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন দেশে তিনি বৈদিক দর্শনের ওপর সেমিনার প্রদান করে থাকেন। ইতোমধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।]

আবির ও তার বন্ধু স্বামীজিকে প্রণাম জানাল। আবিরের বন্ধু স্বামীজির পূর্বপরিচিত। স্বামীজি আবিরের সাথে পরিচিত হলেন। তারপর তাদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো–

আবির: আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।

স্বামীজি: হ্যাঁ, বলো তোমার কী প্রশ্ন।

প্রথম পর্ব

ভগবান সাকার নাকি নিরাকার?

আবির: আমার প্রশ্ন হলো–

- ভগবান তো সর্বব্যাপ্ত। তাঁর কি কোনো আকার হতে পারে?
- আর তাঁর শক্তিসমূহও তো নিরাকার। তাঁকে যদি কোনো রূপ প্রদান করা হয়, তবে কি তাঁকে সীমিত করা হয় না?
- তিনি তো অসীম অনন্ত। অনন্ত অসীম পরমেশ্বর ভগবান কীভাবে রূপ ধারণ করে সীমিত হতে পারেন?
- যেসমস্তরূপে তাদের পূজা করা হয়, সেগুলো কাল্পনিক নয় কি?

ভগবানের কি কোনো আকার হতে পারে?

স্বামীজি : তোমার প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত। আমাদের মনে এধরনের প্রশ্ন আসাটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আমরা আমাদের এই জড় চোখ দ্বারা ভগবানকে দেখতে পারি না। আমি একে একে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি–

ভগবানের আকার থাকতে পারে কি না তা জানতে হলে প্রথমেই তোমাকে ভগবান বা সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে হবে।

ভগবান মানে তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ–

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

(ঈশোপনিষদ, আবাহন মন্ত্র)

তাঁর মধ্যে কোনো অপূর্ণতা থাকবে না। তাই, যদি বলা হয় ভগবানের কোনো রূপ থাকতে পারে না। তবে সেটা অপূর্ণতারই পরিচায়ক। আবার, তিনি সর্বশক্তিমান; সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় সবকিছুর নিয়ন্তা। যদি তাঁর কোনো রূপ না থাকে, তবে কি তাতে

তাঁর সর্বশক্তিমত্তা খর্ব হয় না?

আরেক দিক থেকে, আমরা সকলেই সাকার, আমাদের রূপ রয়েছে, আমাদের পিতারও রূপ রয়েছে, তার পিতারও রূপ ছিল, এটাই স্বাভাবিক। তবে যিনি সকলের আদি পিতা, তিনি কী করে রূপহীন হবেন? অবশ্যই তাঁরও রূপ রয়েছে।

আবার, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা কম গুণসম্পন্ন হবেন না। তাই ঈশ্বর, ভগবান, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা যাই বলি না কেন, তিনি হবেন সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কোনো কমতি বা অভাব থাকবে না। সেজন্য পূর্ণতা হেতু অবশ্যই তাঁর রূপ আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (১/১৫৫/৪) শ্রীবিষ্ণুকে জগতের সকলের স্বামী (প্রভু) ও পালনকর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সূক্তের ৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা অপরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ ও আকুমার এবং তিনি আহবে (যজ্ঞস্থলে) গমন করেন।"

ভগবানের রূপ কি তাঁকে সীমিত করে না?

আবির: যদি আপনি ভগবানকে একটি বিশেষ রূপে চিন্তা করেন তবে কী তাতে ভগবানের অসীমত্বকে সীমিত করা হয় না? কারণ, ভগবান তো সর্বব্যাপ্ত, অসীম, অনন্ত; তিনি কীভাবে একটা সীমিত দেহ ধারণ করতে পারেন?

স্বামীজি: তোমার প্রশ্ন দ্বারাই কি তুমি ভগবানকে সীমাবদ্ধ করছো না? যখন তুমি বলছো, তিনি দেহ ধারণ করতে পারেন না, তার মানে তুমি তাঁকে সীমাবদ্ধ করছো। তুমি কি জানো না যে, তিনি সর্বশক্তিমান?

আবির: নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান?

স্বামীজি: তবে আজকাল কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকেন যে, "ভগবান সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি সবকিছু করতে পারেন না।" কী হাস্যকর কথা!

যাহোক, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, সুতরাং, তিনি একটি নির্দিষ্ট রূপে এক স্থানে বিদ্যমান থেকেও সর্বব্যাপ্ত হতে পারেন। ঠিক যেমন, সূর্য তার স্বরূপে স্বস্থানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আলোকরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে ব্যাপ্ত। যদি সামান্য সূর্যের এ ক্ষমতা থাকে, তবে সর্বশক্তিমান ভগবানের কি সে ক্ষমতা নেই? তুমি বলো যে, তাঁর নির্দিষ্ট রূপ থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন কার্যটি করতে অক্ষম হচ্ছেন? এর কোনো

উত্তর নেই। কারণ, তিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। তাই তিনি একস্থানে থেকেও যুগপৎ সর্বত্র বিদ্যমান। যেমন, ভগবান তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য সত্যে পরিণত করতে এবং অসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে তিনি স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক স্থানে থেকেও তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান। এমনকি তিনি প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান। সুতরাং, রূপ আছে বলে যে, তিনি সসীম, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত অর্থে, ভগবান অসীম হয়েও সসীম হতে পারেন, আবার, তিনি সসীম রূপেও অসীম।

□ ভগবানের তিনটি স্বরূপ

আবির : তবে তিনি কীভাবে সর্বব্যাপ্ত? তাঁর কী কোনো নিরাকার রূপ নেই।

স্বামীজি: হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। অবশ্যই তাঁর নিরাকার রূপ আছে। ঈশ্বর নিরাকার, তিনি সাকার হতে পারেন না, আবার, তিনি সাকার, কিন্তু নিরাকার হতে পারেন না– এ দুটোই অপূর্ণ জ্ঞান। তাই যারা পরমতত্ত্বকে কেবল নিরাকার বলছে, তারা তাঁর আংশিক রূপের প্রতি বিশ্বাস করছে। প্রকৃতপক্ষে, পরমতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ– ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। যেমন, একটি শিশু জানে যে, জল তরল পদার্থ, কিন্তু সে জানে না যে, জলের আরো দুটি রূপ রয়েছে– কঠিন ও বায়বীয়। তারা জলকে স্বীকার করবে, কিন্তু অন্য দুটি রূপকে স্বীকার করবে না, এটাই স্বাভাবিক। এটা তাদের দোষ নয়, অপূর্ণতা। আবার, যদি কেউ একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে অস্বীকার করে, তবে সেটাও অযৌক্তিক। কারণ, একই পদার্থের তিনটি রূপ।

যারা ভগবানকে কেবল নিরাকার নির্বিশেষ বলে দাবি করে, তাদের ধারণা ভুল নয়, অপূর্ণ।

কারণ, তারা এটাকেই মূল স্বরূপ বলে মনে করে। যেমন, কোনো ব্যক্তি (যিনি কখনো ট্রেন দেখেননি) রাতের অন্ধকারে দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখে মনে করতে পারে যে, ট্রেন এক প্রকার আলো। কিন্তু ব্যক্তিটি যখন প্লাটফর্মে ট্রেনটির কাছাকাছি যাবেন তিনি দেখতে পাবেন– ট্রেন
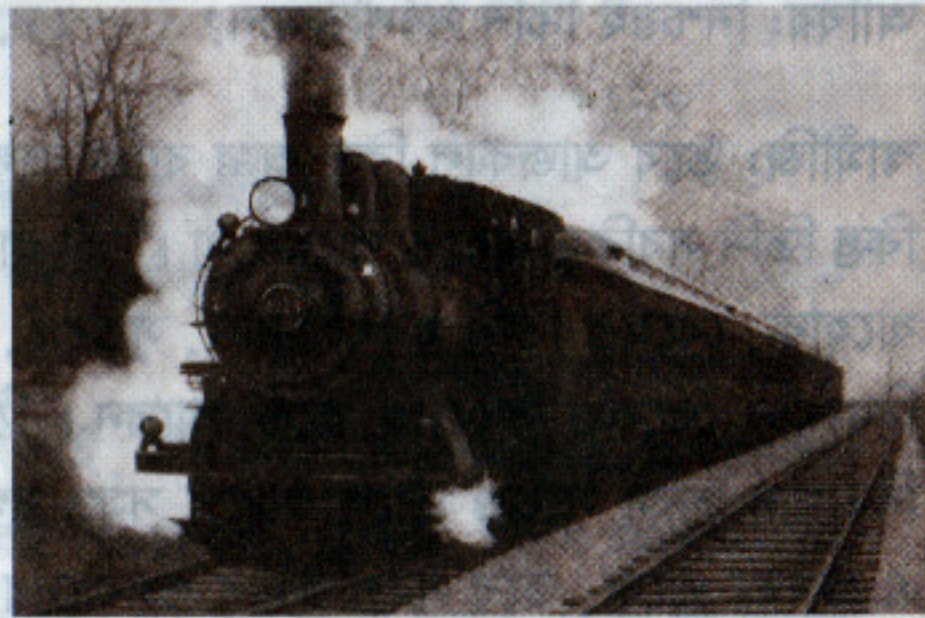
হচ্ছে কতগুলো কামড়ার সমষ্টি ও সর্পিলাকার একটি বৃহৎ যানবিশেষ। আবার, যখন ভেতরে প্রবেশ করবেন বা ট্রেনে চড়বেন, তখন তার বাস্তব উপলব্ধি হবে যে, ট্রেন প্রকৃতপক্ষে কী বস্তু। একইভাবে, নির্বিশেষবাদী বা নিরাকারবাদীরা মনে করে যে, ভগবানের নির্বিশেষ রূপই সবকিছু। এটা ঠিক দূর থেকে ট্রেনের আলোক দর্শনের মতো।

ব্রহ্ম

আবির: তবে ব্রহ্ম কী? পরমাত্মা কী? আর ভগবানই বা কী?

পরমাত্মা

স্বামীজি: এ ব্যাপারে বেদান্ত সূত্রের মূল ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১.২.১১) ব্যাসদেব নিজেই প্রমাণ দেখিয়েছেন–

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁকেই পরমার্থ বলেন। এই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভাগবান – এ তিন নামে অভিহিত হন।"

এখানে বলা হচ্ছে তিনি *অদ্বয়*, মানে তিনি দুই নন, এক। *একমেব অদ্বিতীয়ম্*। এই অদ্বিতীয় বস্তু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন– ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। এখন প্রশ্ন হলো ব্রহ্ম কী?

ভগবান

ব্রহ্ম: ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গনিঃসৃত জ্যোতি এবং তা ভগবানের জ্যোতির্ময় স্বরূপ। যাকে আমরা নিরাকার বলে আখ্যায়িত করে থাকি। যে স্বরূপে তিনি সর্বব্যাপ্ত।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
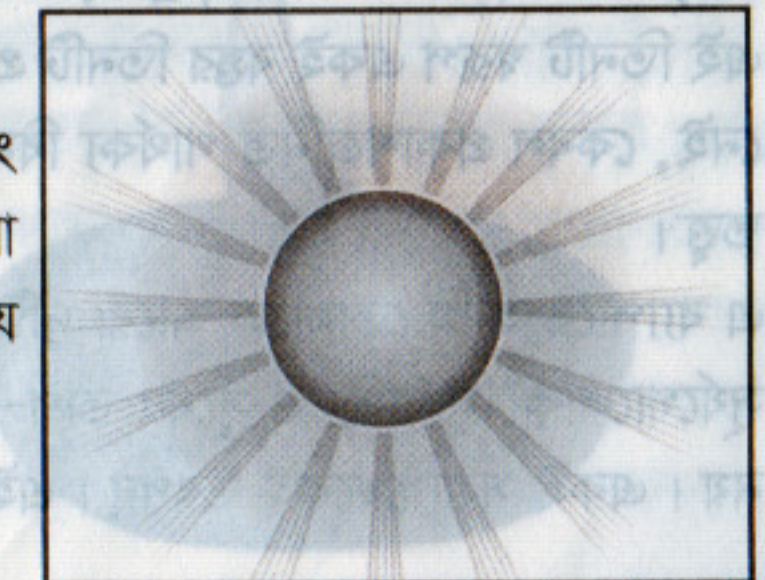
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪০)

"যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

পরমাত্মা: যে স্বরূপে ভগবান প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে বলা হয় পরমাত্মা। পরমাত্মা প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে–

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

"এই শরীরে আরেকজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।"

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরণ্যঃ পিপ্পলাং স্বাদ্বত্ত্য অনশ্নন্ন অন্যোহভিচাকশীতি ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/৬)

"একটি গাছে দুটি পাখি আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি গাছে ফলগুলো খাচ্ছে, আর অন্যটি সেই কাজ লক্ষ্য করছে। লক্ষ্যকারী পরমাত্মা এবং ফল ভক্ষণকারী জীবসত্তা।"

ভগবান: যে স্বরূপে তিনি তাঁর নিত্য ধামে নিত্যস্বরূপে সর্বদা বিরাজ করেন, সেটা ভগবান স্বরূপ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৭)

"যে অখিলাত্মভূত (সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থানকারী) গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন নয় যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান– তিনটি আলাদা ব্যক্তিসত্তা। এই তিনটি স্বরূপ একই বস্তুর তিনটি প্রকাশ। তাঁদের মধ্যে সত্তাগত কোনো পার্থক্য নেই, কেবল প্রকাশজনিত পার্থক্য বিদ্যমান। তাই একে বলা হয় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব।

এ ব্যাপারে আমি তোমাকে আরো দুটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছি–

সূর্যগোলোক, সূর্যরশ্মি ও সূর্যের তাপ– এই তিনটি কোনো ভিন্ন সত্তা থেকে উৎপন্ন নয়। একই সত্তা থেকেই উৎপন্ন। এই তিনটিকে আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করা

যায় না। কেউ যদি সূর্যকে অস্বীকার করে সূর্যরশ্মি বা আলোকেই প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে, তবুও সেটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা জানি, ভগবান সকল জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তবে কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায়, তখন কি ঐ দেহে ভগবান অবস্থান করেন? এর কী উত্তর হবে? আত্মা তো দেহ ছেড়ে চলে গেছে। তবে ভগবান যদি সর্বত্র বিরাজমান হন, তিনি কি মৃতদেহে বিরাজ করেন না? অবশ্যই করেন। কীভাবে? এখানে প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিটি জীবদেহে ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। আর মৃতদেহে ভগবান কেবল ব্রহ্মরূপে বিরাজ করেন। একটি জীবিত দেহে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা দুটিই বিরাজ করে। আর মৃত দেহে ভগবান ব্রহ্মরূপে বিরাজ করেন।

তাই সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান তিনটিই সৃষ্টিকর্তার রূপ। কোনোটিই পৃথক সত্তা নয়। একই সৃষ্টিকর্তার রূপভেদ। এই তিনি তত্ত্বের কেবল একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে অস্বীকার করা ভগবতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

☐ নিরাকার ব্রহ্মের উৎস সাকার ভগবান

আবির: কিন্তু আমি তো শুনেছি, ব্রহ্মই সকল কিছুর উৎস। ব্রহ্ম থেকেই সকল কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্ম যখন কোনো বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু আদি বিভিন্ন অবতাররূপে লীলা করেন। ব্রহ্ম নিরাকার। এই নিরাকার ব্রহ্ম থেকেই অন্যসব প্রকাশসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই নয় কি?

স্বামীজি: না, তোমার ধারণা ভুল। **একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যাক। যেমন, সূর্য সাকার। তার থেকে নির্গত রশ্মি ও তাপ নিরাকার। এখন প্রশ্ন হলো সূর্যরশ্মির উৎস সূর্য; নাকি সূর্যের উৎস সূর্যরশ্মি। আবার, প্রদীপ থেকে শিখা নির্গত হয়, বাল্ব থেকে আলো নির্গত হয়। আলো এবং শিখা নিরাকার, কিন্তু তার উৎস বাল্ব সাকার। শক্তিমান থেকেই শক্তির প্রকাশ হয়। তাই শক্তিমান সাকার, কিন্তু শক্তি নিরাকার। একইভাবে, ভগবানের দেহনির্গত জ্যেতিরূপব্রহ্ম নিরাকার; কিন্তু ব্রহ্মের উৎস ভগবান সাকার।** একথা ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭)

স্পষ্ট করে দিয়েছেন–

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

"আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অব্যয় অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।"

☐ ভগবানের মনুষ্যাকৃতি অবশ্যই কাল্পনিক নয়

আবির: স্বামীজি, আমি বুঝতে পেরেছি ভগবান সাকার। কিন্তু কেউ কেউ বলেন তাঁর নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। আবার, কেউ বলেন, তাঁর রূপ অবশ্যই মানুষের মতো নয়।

স্বামীজি: ভগবান শূন্যের মতো নয় যে, তাঁর নির্দিষ্ট আকার থাকবে না। তিনি পরম সত্য, নিত্য, অব্যয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সুতরাং, অবশ্যই তাঁর নির্দিষ্ট রূপ আছে। আর যারা বলে যে, ভগবানের রূপ মানুষের মতো নয়, তারা কি তা দেখেছে? না দেখে এমন মন্তব্য করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখন তুমি বলতে পারো– যারা বলে ভগবানের রূপ মনুষ্যাকৃতির, তারা কি তা দেখেছে। হ্যাঁ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানকে দর্শন করেই তাঁর রূপের বর্ণনা করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ রয়েছে বৈদিক শাস্ত্রে; আর আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলছি যে, ভগবানের রূপ অবশ্যই মনুষ্যাকৃতির। তাছাড়া, বৈদিক শাস্ত্র ব্যতীতও পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে তা উল্লেখ রয়েছে। যেমন:

খ্রিস্টান ধর্মে বাইবেলের ইজিকিয়েল (১.২৬) এ বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের রূপের সাথে মানব রূপের সাদৃশ্য রয়েছে (দি সেমব্লান্স্ অব হিউম্যান ফর্ম)।

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর সিররুল আসরার গ্রন্থে হুজুর (সাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– "*রাইআতু রাব্বী আলা ছুওরাতি আমরাদি।*" অর্থাৎ, "আমি আমার রবকে দাড়ি-গোফবিহীন যুবকের আকৃতিবিশিষ্ট দেখেছি।"

বৌদ্ধ ধর্ম মূলত প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ এবং বৌদ্ধরা নির্বাণে বিশ্বাসী। তবু তারা ভগবান বুদ্ধদেবরূপে মনুষ্য আকৃতিরই আরাধনা করে।

তবে, সনাতন শাস্ত্রে ভগবানের রূপ সবচেয়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে– তিনি ত্রিভঙ্গললিত গোপবেশধারী নবঘনশ্যাম, নিত্য যৌবনসম্পন্ন আদি পুরুষ, তাঁর শিরোভূষণ শিখিপুচ্ছ ও কিরীট-

শোভিত, প্রফুল্ল নয়নদ্বয় পদ্মপাঁপড়ির ন্যায় আয়তাকার ও মোহনীয়, অপরূপ অধর মোহনমুরলীগান তৎপর, গলদেশে দোলায়িত চন্দ্রকশোভিত বৈজয়ন্তীমালা, দিব্য আভরণভূষিত তাঁর অতুলনীয় সুন্দরাঙ্গ কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকেও হার মানায়। তিনি তাঁর রূপের দ্বারা সারা জগৎকে মোহিত করেন বলে তাঁর আরেক নাম ভুবনমোহন।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপকে দুর্লভদর্শন ও শ্রেষ্ঠ বলেছেন (সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপং... –১১/৫২)।

সুতরাং, শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে অনন্তরূপ পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ মনুষ্যাকৃতির। কিন্তু মনুষ্যাকৃতির হলেও মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হলো, তাঁর শরীর নিত্য, অবিনশ্বর, তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের মতো জড় নয় চিন্ময় (চেতনাময়), তিনি তাঁর যেকোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য যেকোনো ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন এবং তাঁর দেহ অসীম শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার।

☐ ভগবানের মধ্যে যুগপৎ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান

আবির: তাহলে একই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য কি করে সম্ভব?

স্বামীজি: তুমি ঠিকই বলেছ। সাধারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। আর অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ছাড়া সর্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব নয়। সর্বশক্তিমান না হলে অনন্ত মহিমাও থাকা সম্ভব নয়। বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ না হলে কেবল অবিরুদ্ধ বা একপক্ষীয় ধর্ম সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক হয় না। যেমন : কোনো ক্ষুদ্র বস্তু যদি বৃহৎ হতে না পারে, তবে তাকে যেমন সর্বশক্তিমান বলা যায় না, তেমনি কোনো বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র হতে না পারলেও তা সর্বশক্তির পরিচায়ক নয়। যা অসম্ভব, তা-ই সম্ভব হলে তাকে বলে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্ম। যুগপৎ হন, আবার নন। যেমন, ভগবান সাকার হয়েও নিরাকার হতে পারেন এবং ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। এখানেই তাঁর সর্বশক্তিমত্তার পরিচয়। ভগবানের বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্ম বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

❑ শাস্ত্রীয় প্রমাণঃ

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (শ্বেতাশ্বতর উ. ৩/২০) অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর, বৃহৎ থেকেও বৃহত্তর।

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (পুরুষসূক্ত) অর্থাৎ তিনি জন্মরহিত হয়েও বহু প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন।

"মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ..." (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ তিনি মূর্ত, তিনিই অমূর্ত।

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ..." (মুণ্ডক উ. ৩/১/৭) অর্থাৎ তিনি দূর থেকেও সুদূরে এবং নিকট থেকেও নিকটে।

"অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা..." (শ্বে. উ. ৩/১১) অর্থাৎ তিনি হস্তপদরহিত হয়েও গমন ও গ্রহণ করেন।

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ..." (শ্বে. উ. ৩/১৬) অর্থাৎ সর্বত্র তাঁর হস্ত ও পদ বিস্তৃত। আবার তিনি *"অপাণিপাদো..." (শ্বে. উ. ৩/১৯)* অর্থাৎ হস্ত-পদহীন।

"পশ্যত্যচক্ষুঃ..." (শ্বে. উ. ৩/১৯) অর্থাৎ তিনি অচক্ষু হয়েও দেখেন। আবার তিনি *"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (শ্বে. উ. ৪/১৪)* অর্থাৎ তিনি সহস্র সহস্র শির, চক্ষু ও চরণবিশিষ্ট।

"অরসনিত্যমগন্ধবচ্চ..." (কঠ উ. ১/৩/১৫) অর্থাৎ তিনি অরস ও গন্ধহীন– তিনি নিত্য। আবার *"সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ..." (ছান্দো. ৩/১৪/২)* অর্থাৎ তিনিই সর্বগন্ধ, সর্বরস।

❑ ভগবান বা দেবদেবীগণের রূপ কি কাল্পনিক?

আবিরঃ হ্যাঁ স্বামীজি, বুঝতে পারলাম যে, ভগবান প্রকৃতপক্ষে সাকার, তাঁর রূপ রয়েছে। দেবদেবীদেরও কি রূপ রয়েছে? আমি শুনেছি, তাদের সমস্ত রূপই কাল্পনিক। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কোনো রূপ নেই, তারা কেবলই শক্তি।

স্বামীজিঃ না, মোটেও কাল্পনিক নয়। কেননা বৈদিকশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে এ সকল রূপের বর্ণনা রয়েছে। আর বৈদিকশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন ব্যাসদেব স্বয়ং, যিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েই তিনি বৈদিক জ্ঞান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। কেবল ভগবানেরই নয়, দেবদেবীদেরও রূপ রয়েছে। বেদেই সে বিষয়ে উল্লেখ আছে। যেমন–

শিব প্রসঙ্গে অথর্ববেদ সংহিতা, একাদশ কাণ্ড, প্রথম অনুবাক, ৫ম সূক্তে বর্ণিত হয়েছে–**"হে ভব, তোমার যে বিমোহক তনু আছে, জগতের সাক্ষী, অমরণধর্ম**

তোমাকে নমস্কার। হে পশুপতি, তোমার মুখের উদ্দেশ্যে নমস্কার। সেরূপ তোমার শরীরের চর্ম, নীলপীতাদি বর্ণ, সম্যকদর্শন ও প্রত্যগাত্মরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার হস্তপদাদি অঙ্গের উদ্দেশ্যে নমস্কার। লীলাবিগ্রহধারী তোমার উদর, জিহ্বা, মুখ, দন্ত ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার।"

বরুণদেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সংহিতায় (১/২৫/১৬, ১৮) বলা হয়েছে–**"বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট। সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দেখেছি, ভূমিতে তাঁর রথ বিশেষ করে দেখেছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন।"**

দেবীদুর্গার রূপ বর্ণনা করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

দেবী দুর্গার কেশরাজি জটাজুট সমাযুক্তা, অর্ধচন্দ্র শোভিত শেখরা এবং ত্রিনয়নী। তাঁর বদন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, বর্ণ অতসী ফুলের মতো হরিদ্রাভ। তিনি ত্রিলোকে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নবযৌবন সম্পন্না, সর্বাভরণ-ভূষিতা, সূচারু-দশনা, পীনোন্নত পয়োধরা। তাঁর দক্ষিণ পঞ্চকরে উর্ধ্ব- অধঃক্রমে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করে ঐরূপক্রমে খেটক, ধেনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু শোভিত। দেবীর পদতলে ছিন্ন স্কন্ধ মহিষ। উক্ত মহিষ থেকে উদ্ভূত এক খড়গপাণি দানব। দেবীর নিক্ষিপ্ত শূল ঐ দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করছে।

ধর, একজন অদেখা, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আজ তোমার সাক্ষাৎ করতে হবে। তার সম্বন্ধে জানে এমন আরেকজন যদি তোমাকে বলে দেন যে, সেই ব্যক্তির নাম অমুক, দেখতে খুব লম্বা, গায়ের রং কুচকুচে কলো, মাথায় কোকড়া চুল, উন্নত নাসিকা, দাঁতগুলো খুব সুন্দর ধবধবে সাদা, পরনে নীল শার্ট, কালো প্যান্ট, মাথায় ক্যাপ, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা এবং তিনি অমুক জায়গায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে তুমি কি তাকে চিনতে পারবে?

আবিরঃ একশভাগ চিনতে পারব। শুধু আমি কেন, এমন বর্ণনা থাকলে সকলেই চিনতে পারবে।

স্বামীজিঃ চিত্রশিল্পীকে যদি কোনো বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়, তাহলে তিনি বর্ণনা অনুযায়ী সেই বিষয়কে তার চিত্রে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন কি না?

আবিরঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবেন।

বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর আঁকা আলেজেন্ডারের ছবি

স্বামীজি: ইতিহাসে আলেকজেন্ডারের বর্ণনা রয়েছে। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধ করতেন। মাথায় বাঘের মুখখচিত মুকুট ধারণ করতেন। তার মুকুটে ঝুটি ছিল। তার চোখ বিশেষ বর্ণের ছিল। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। তা দেখে পৃথিবীতে বিভিন্ন চিত্রশিল্পী আলেকজেন্ডারের ছবি এঁকেছে। যে ভঙ্গিমায়ই থাকুক না কেন, আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ছবিতে দেখলে বুঝতে পারি এটা আলেকজেন্ডারের ছবি। যদিও বর্তমান সমাজে কেউ আলেকজেন্ডারকে দেখেনি।

সুতরাং, একটি শিশুকে যদি শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন ভঙ্গিতে আঁকা দেবীদুর্গার অনেকগুলো ছবি দেখিয়ে বলা হয় যে, উনি কে? তবে হাতে ত্রিশুল, ত্রিনয়ন, দশভূজা, সিংহবাহিনী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখে শিশুটি বুঝতে পারবে যে এটা দেবী দুর্গাই। কারণ, যে ভঙ্গিতেই থাক না কেন, প্রতিটি ছবিতেই একই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে। এভাবে শিব, ব্রহ্মা আদি অন্যান্য দেবদেবীদেরও রূপের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। সেই বর্ণনানুসারে তাঁদের বিগ্রহ তৈরি করে সেবা-পূজা করা হয়। তাই শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে যখন ভগবান বা দেবদেবীগণের চিত্র আঁকা হয় বা প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়, তখন অবশ্যই সে রূপ কাল্পনিক নয়।

আবির: স্বামীজি, অত্যন্ত সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। এভাবে আগে কখনো ভাবিনি।

দ্বিতীয় পর্ব

মূর্তিপূজার অপব্যাখ্যার শাস্ত্রীয় সমাধান

☐ ন তস্য প্রতিমা অস্তি– অপব্যাখ্যার সমাধান

আবির: আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদে নাকি ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– *"ন তস্য প্রতিমা অস্তি"* অর্থাৎ, তাঁর কোনো প্রতিমা নেই। তাহলে আমরা যে ভগবান বা বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিকৃতি বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করি, সেটা কি ঠিক?

স্বামীজি: তুমি যে শ্লোকটির কথা বলছ, এটি বেদের শ্লোক সত্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও তার উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু তুমি এর যে অর্থ বলছ তা সঠিক নয়। যাদের বেদ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা নেই, তারা যজুর্বেদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দুটি শ্লোকের মাঝখানের কিছু অংশ তুলে ধরে এর কদর্থ করে বলে, পরমেশ্বরের কোনো প্রতিকৃতি নেই। তোমরা শিক্ষিত যুবক। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে, 'প্রতিমা' শব্দের অর্থ কী? সংস্কৃত 'প্রতিমা' শব্দটি 'প্রতিম' শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন।

প্রতিম = প্রতি + মা + অ

প্রতিমা = প্রতি + মা + অ + আ

'প্রতিম' শব্দের অর্থ 'তুলনীয়' এবং 'অপ্রতিম' অর্থ 'অতুলনীয়'। 'প্রতিম' থেকেই 'প্রতিমা' শব্দটি এসেছে। তাই *"ন তস্য প্রতিমা অস্তি"*– শ্লোকাংশটির অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর কোনো তুলনা নেই। আরো ভেঙ্গে বলতে গেলে, তাঁর তুল্য কেউ নেই। তিনি অসমোর্ধ্ব। বর্তমানে বাংলায় প্রতিমা শব্দটি প্রতিকৃতি বা দেবমূর্তি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই প্রতিকৃতি কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সদৃশ কোনো রূপ ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক যেমন, সন্দেশ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংবাদ বা খবর। আবার, এর আরেকটি অর্থ মিঠাই বা খাবার বিশেষ।

শব্দার্থবিদ্যায় এরকম বহু অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে এমন শব্দের অভাব নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমনঃ

সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্যক্ষ্যঃ কেশরী হরিঃ। (অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)
শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ। (নক্ষত্রাভিধান)

এখানে প্রথম বাক্যে 'হরি' শব্দে 'সিংহ' ও পরের বাক্যে 'হরি' অর্থে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে' বোঝানো হয়েছে। এরকম অসংখ্য শ্লোক সংস্কৃতে পাওয়া যাবে। তাই বলে সিংহের স্থলে ভগবান ও ভগবানের স্থলে সিংহের প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই তাকে মূর্খ ছাড়া অন্য কিছু বলা হবে না।

সাধারণ 'চরণ' শব্দের কতগুলো অর্থ দেখো– ১. পা ২. কবিতার পঙক্তি ৩. ভ্রমণ ৪. আচরণ।

আবার ইংরেজির ক্ষেত্রেও এরকম শব্দ পাওয়া যায়। যেমন 'Kind' শব্দটির একটি অর্থ 'দয়ালু' আরেকটি অর্থ 'প্রকার'। এরকম সব ভাষাতেই এ ধরনের বহু শব্দ রয়েছে। সংস্কৃতের তো কথাই নেই। **সেক্ষেত্রে প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেখতে হবে যে, কোন অর্থে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে।**

অথচ কতিপয় প্রতারক বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/১৯) এ শ্লোকের পুরো শ্লোকটিতে বলা হয়েছে–

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ॥

"কেউ তাঁর আদি, মধ্য, অন্ত উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি গ্রাহ্যাতীত বস্তু। তাঁর কোনো উপমা নেই। তাঁর নাম অনন্ত মহিমাপূর্ণ।" কিন্তু জনৈক টিভি বক্তার কথায় প্রভাবিত হয়ে অনেকে শুধু মাঝের উক্তিটিই তুলে ধরে শ্লোকের অপব্যাখ্যা করছেন।

শুক্লযজুর্বেদে ৪০টি অধ্যায়। তার মধ্যে ৩২তম অধ্যায়টি উৎসর্গ করা হয়েছে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির উদ্দেশ্যে। সেখানে প্রশংসা করা হয়েছে বরুণ, বৃহস্পতি এবং ইন্দ্রের। সেখানে ভগবানের প্রতিকৃতি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। সেখানকার ৩২/৩ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে,

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎযশঃ
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা
যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥"

অর্থাৎ "ভগবানের তুলনা দেওয়ার কিছু নেই। তাঁর মহৎ যশ আছে। 'তিনি হিরণ্যগর্ভ', 'তাঁর প্রতি অসূয়পরায়ণ হয়ো না', 'তাঁর থেকে থেকে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ জাত,

তিনি স্বরাট' ইত্যাদি বাক্যে ভগবানকে বোঝানো হয়েছে।"

শ্লোকটিতে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে– দেব-দেবীদের উৎস সম্পর্কে। ভগবানের সাথে (তাঁর সৃষ্ট) দেবদেবীদের কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। তিনি সৃষ্টির আদি, তাঁর জন্ম নেই। কিন্তু বেদে কোথাও বলা হয়নি যে, ভগবানের প্রতিমা বা প্রতিকৃতি তৈরি করা যাবে না। যেখানে প্রতিমা অর্থে শ্লোকের পূর্বে ও পরে মূর্তির কোনো প্রসঙ্গই নেই, সেখানে একশ্রেণির প্রতারক শব্দের যথার্থ অর্থ না বুঝে অর্ধকুক্কুটির ন্যায় কেবল আংশিক অর্থ করে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করছে। তাদের যথার্থ উত্তর দেয়ার জন্য আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সে বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে জানা উচিত।

☐ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতা– অপব্যাখ্যার সমাধান

আবিরঃ আরো কটি বিষয় আমি সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইট ভিজিট করে পেয়েছি; সেখানে মূর্তিপূজা বিষয়ে নেতিবাচক আরো কিছু রেফারেন্স আমাদের শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করেছে, যা পড়ে ধর্ম বিষয়ে আমাদের মতো নিতান্তই অজ্ঞ লোকের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেখানে যে বিষয়গুলো তারা লিখেছে তা হলো–

"হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে–

১. ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০– যাদের বোধশক্তি পার্থিব আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু তারাই উপদেবতার নিকটে উপাসনা করে।

২. যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০, মন্ত্র ৯– *অন্ধতম প্রভিশান্তি ইয়ে অসম্ভূতি মুপাস্তে* – যারা অসম্ভূতির পূজা করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তারা অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয় শাম মূর্তির পূজা করে। অসম্ভূতি হলো প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন– বাতাস, পানি, আগুন। শাম মূর্তি হলো মানুষের তৈরি বস্তু, যেমন – চেয়ার, টেবিল, মূর্তি ইত্যাদি।"

স্বামীজিঃ ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন–

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম্ প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

অর্থাৎ, "বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

আর ২০নং শ্লোকে বলা হয়েছে– "জড় কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় *(কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ...)*।" এখানে উপদেবতা বলে কিছু নেই। একটু লক্ষ্য কর; ১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

জ্ঞানবান মাম্ প্রপদ্যতে। আর, ২০নং শ্লোকে বলা হয়েছে– *হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ।* আবার, ৭/২৩ শ্লোকে বলা হয়েছে– "দেবতাদের উপাসনালব্ধ ফল অস্থায়ী, দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন।"

ভগবদ্গীতার পুরো ৭ম অধ্যায় জুড়ে ভগবানের মহত্ত্ব এবং বিশেষত ১৯-২৩নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের তথা ভগবানের উপাসনার সঙ্গে দেবতাদের উপাসনার পার্থক্য দেখানো হয়েছে এবং দেবতাদের উপাসনা অপেক্ষা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খরা এই অন্য দেবতা বা **দেবোপাসনা শব্দটিকে মূর্তিপূজা বলে অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।** প্রকৃতপক্ষে, গীতার ৭/২০ শ্লোকে মূর্তিপূজার কোনো প্রসঙ্গই নেই। বরং, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা বিগ্রহ নির্মাণ করে তাঁর আরাধনা করে, তবে তা সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা এবং তা শাস্ত্রসম্মত। আমি তোমাকে তার প্রমাণ দেখাব।

☐ সম্ভূতি, অসম্ভূতি– অপব্যাখ্যার সমাধান

আর যজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায়ের ৯নং শ্লোকের তুমি যে ব্যাখ্যা শোনালে তা সম্পূর্ণরূপে অপব্যাখ্যা এবং অসম্ভূতি ও সম্ভূতি শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে তা ভুল। তাছাড়া, এখানে 'শাম মূর্তি' শব্দেরই বা উৎস কী?

মূল শ্লোকটি হলো–

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥

অর্থাৎ, "দেবতাদের উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু পরমতত্ত্বের সাকারত্বকে অস্বীকার করে নিজেকে ব্রহ্মের সমকক্ষ মনেকরে যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ ও নাস্তিকরা, তারা আরো অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।" ঈশোপনিষদের ১২নং মন্ত্রে এ একই মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। এখানে সংস্কৃত 'অসম্ভূতি' শব্দের অর্থ– যাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এরূপ বিনাশশীল দেব, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি যোনিসমূহ। একারণে ঈশোপনিষদের ১৪নং শ্লোকে 'অসম্ভূতি' স্থানে স্পষ্টরূপে 'বিনাশ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। আর 'সম্ভূতি' শব্দের অর্থ– যাঁর সত্তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান, যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী অবিনাশী পরব্রহ্ম পরম-পুরুষোত্তম ভগবান।

যে মানুষ বিনাশশীল স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, কীর্তি, অধিকার প্রভৃতি এ লোকের

ও পরলোকের ভোগ সামগ্রীতে আসক্ত হয়ে সেসবকেই সুখের হেতু মনে করে, সেসবেরই অর্জনে, রক্ষণে বা ভোগে সদা রত থাকে এবং এসব ভোগসামগ্রীর প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদির উপাসনা করে, তাদের উপাসক ভোগাসক্ত মানুষ ও দেবোপাসনার ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেবলোক ও ভোগযোনি প্রাপ্ত হয়। এই হলো তার অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করা বা 'অসম্ভূতি' উপাসনার ফল (গীতা-৭/২০-২৩)। কিন্তু যদি কেউ ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে দেবোপাসনা করে, তবে সে অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর হয়। বৃন্দাবনের ব্রজগোপিকারা কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার উদ্দেশ্যে। তাই–

দেবতা পূজিব মোরা, না হব ভোগপর।
দেবতার কাছে মেগে নেব কৃষ্ণভক্তি-বর ॥

আর যে মানুষ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অশ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত ভোগাসক্তির কারণে ভগবান এমনকি দেবতাদেরও উপাসনা করে না; অধিকন্তু নিজেকে ভগবান বলে মনে করে (*অহম্ ব্রহ্মাস্মি*) দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়, সেরূপ দাম্ভিক ব্যক্তি নিজের দুষ্কর্মসমূহের কুফল ভোগ করতে বাধ্য হয়ে কুকুর-শূকর প্রভৃতি যোনিসমূহে এবং রৌরব-কুম্ভী-পাকাদি নরকসমূহে গমন করে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এই হলো তার অনিত্য দেবতাদের উপাসনাকারী অপেক্ষা অধিকতর ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ (গীতা-১৬/১৮-১৯)। এটাই এ শ্লোকে সম্ভূতি শব্দের প্রকৃত অর্থ। এজন্য ঈশোপনিষদের ১৪নং শ্লোকে দেবতা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও উর্ধ্বে পরমপুরুষ ভগবানের তত্ত্ব যথার্থরূপে জেনে তাঁর আরাধনার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জড়জগৎ অতিক্রম করে সনাতন ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, উক্ত শ্লোকে দেবোপাসনা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে; প্রাকৃতিক বস্তু বা মানবসৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলা হয়নি। তাই মূর্তিপূজার বিষয়টিও এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

আবির: আপনার কাছ থেকে আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে এতো প্রাঞ্জল ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হলাম। অথচ কীভাবে কিছু লোক এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দ্বারাই আমার মতো ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করছে।

তৃতীয় পর্ব
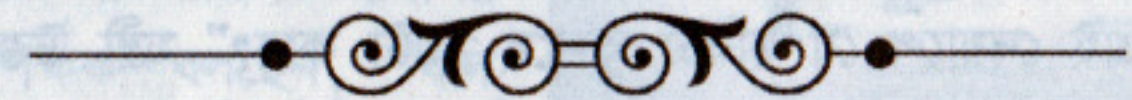
মূর্তিপূজার বৈজ্ঞানিকতা

☐ জড়বস্তু নির্মিত মূর্তিতে কি ভগবান অবস্থান করতে পারেন?

আবির: কিন্তু ব্যবহারিকভাবে আধুনিক সমাজের প্রেক্ষিতে বিচার করলে জড় উপাদান দিয়ে তৈরি, সাধারণ মূর্তিতে কীভাবে ভগবান অবস্থান করতে পারেন? বিষয়টি যদি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝিয়ে বলতেন...।

স্বামীজি: ভগবান কেবল তাঁর বিগ্রহের মধ্যেই নয়, সর্বত্র বিদ্যমান। ভগবান বিগ্রহে থাকতে পারেন না– এই উক্তির দ্বারা কি তাকে সীমাবদ্ধতা করা হয় না? ভগবান সর্বত্র থাকতে পারেন, তার মানে কি তিনি বিগ্রহে অবস্থান করতে পারেন না?

☐ জড়বস্তুর প্রতি কেন সম্মান প্রদর্শন করব?

আবির: বুঝলাম মূর্তিতে ভগবান অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু মূর্তিতো জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। সামান্য জড় বস্তুর প্রতি কেন সম্মান প্রদর্শন করব?

স্বামীজি: এ প্রসঙ্গে আমি তোমাকে একটি কাহিনী বলছি। একবার এক রাজার দরবারে এক ধর্মযাজক এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ভগবানের কোনো প্রতিকৃতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি সেই ধর্মযাজককে মূর্তিপূজার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। ধর্মযাজক তখন রাজার পাশে দাঁড়ানো মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন– "মন্ত্রীমহাশয়, এই দেয়ালে যে ছবিটা ঝুলছে, এটা কার?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "এটা মহারাজের পিতার ছবি।" ধর্মযাজক মন্ত্রীকে ছবিটি নিচে নামাতে অনুরোধ করলেন। মহারাজের অনুমতিক্রমে মন্ত্রী ছবিটি নামালেন। তখন ধর্মযাজক বললেন,

"মন্ত্রীমহাশয়, কৃপা করে এই ছবিটিতে থুতু দিন।" সমগ্র রাজসভা উত্তপ্ত হয়ে গেল। মহারাজের পিতার ছবিতে থুতু! মহারাজও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। ধর্মযাজক বললেন, "মহারাজ, দয়া করে শান্ত হোন। এটা তো আপনার পিতা নয়, আপনার পিতার ছবি। এতে আপনি কেন এত ক্রোধিত হচ্ছেন। ছবিতে থুতু দিলে তো তা আপনার পিতার গায়ে লাগবে না।" মহারাজ গম্ভীর স্বরে বললেন, "এটা আমার পিতার ছবি হলেও আমি এই ছবিকে পিতার মতোই সম্মান করি।"

ধর্মযাজক তখন মুচকি হেসে বললেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। আপনার পিতার ছবিকে অসম্মান করলে যদি পিতাকে অসম্মান করা হয়, তবে ভগবানের প্রতিকৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করলে কী ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না?

প্রকৃতপক্ষে, এ জগতে সবাই ছবিকে ব্যক্তি বলে মনে করে। ব্যক্তির সাথে কেউ খারাপ আচরণ করলে, আর ছবির সাথে খারাপ আচরণ করলে সমান অনুভূতি হয়। বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির ছবিকে অমার্যাদা করলে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বাইবেল বা কোরান শরীফের প্রতি সাধারণ বইয়ের মতো আচরণ করা হয় না। যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়। কোনো মন্দির বা কাবা শরীফের ছবিকে কি সাধারণ ছবির মতো দেখা হয়? আবার, আল্লাহ্ বা ভগবানের নাম লেখা কোনো কাগজকে সাধারণ বলে মনে করা হয় না। বরং, ভগবান বা আল্লাহর প্রতিভূ বলে মনে করা হয়। তাই, এ ক্ষেত্রে জড় বস্তু হলেও সকলেই তাকে সম্মান করছে।

ঠিক এভাবে, ভক্ত ভগবানের প্রতিকৃতিতে তাঁর আত্যন্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যা দেখে ভগবান অত্যন্ত প্রীত হন।

আবির: কিন্তু এই বিগ্রহ কি ভগবানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য প্রদান করতে পারে?

স্বামীজি: অবশ্যই কেন নয়? মনে করো, ভূগোল ক্লাসে শিক্ষক বোর্ডে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখাচ্ছে– এটা চট্টগ্রাম, এটা মালয়েশিয়া, এটা আমেরিকা, এটা ভারত মহাসাগর, এটা প্রশান্ত মহাসাগর, এটা আটলান্টিক মহাসাগর ইত্যাদি। শিক্ষক বলছেন, "যদি আপনি নিউইয়র্ক শহরে যেতে চান,

তবে এ রাস্তা দিয়ে আপনাকে যেতে হবে।" বোর্ডে দেখানো এই বিবরণ অনুসারে কেউ আমেরিকা যেতে পারবে কি না?

আবির: হ্যাঁ পারবে।

স্বামীজি: কিন্তু কেউ যদি বলে যে, স্যার আপনি ভুল বলছেন, এটা তো আমেরিকা নয়, আটলান্টিক মহাসাগরও নয়, এখানে তো কোনো জল নেই। এটা কেবল একটা বোর্ড, তাহলে সে কখনোই আমেরিকা যেতে পারবে না।

☐ বিভিন্ন ধর্মে প্রতীকের ব্যবহার

তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলোও প্রতীকের ব্যবহার করে থাকে। প্রতীকের মাধ্যমে তারা তাদের সংস্কৃতি ও দর্শনকে প্রচার করে থাকে। যদি এই প্রতীককে অসম্মান করা হয়, তবে তা ঐ ধর্মের সংস্কৃতিকে অপমানিত করা হয় না কি? তাছাড়া যারা মূর্তি বা বিগ্রহের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, তারাও কী এক অর্থে প্রতীক বা মূর্তিকে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে না? আমরা বিশেষ একটি বস্তুকে অশ্রদ্ধাপূর্বক পাথর নিক্ষেপের কথা জানি, তাতে করে তারা পাথর নিক্ষেপের দ্বারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। যদি জড় বস্তুতে পাথর নিক্ষেপের দ্বারা বিশেষ অশুভ শক্তির উদ্দেশ্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তবে কী বিগ্রহে পুষ্পাদি দ্রব্য অর্পণের দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না? অর্থাৎ, দার্শনিকভাবে তারাও বিগ্রহের দর্শনকে স্বীকার করছে।

☐ বিগ্রহ ভগবানের অনুমোদিত প্রতিভূ

আবির: কিন্তু বিগ্রহ কী ভগবানের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে?

স্বামীজি: ভগবানের বিগ্রহ ভগবানের অনুমোদিত প্রতিভূ, তাই বিগ্রহে কোনোকিছু নিবেদন করলে তা ভগবানকেই নিবেদন করা হয় এবং ভগবান সেই প্রীতিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করেন। যেমন–

সরকার অনুমোদিত ডাকবাক্সে চিঠি ফেললে তা যথাস্থানে পৌঁছায়, কিন্তু একইরকম আরেকটি বক্সে চিঠি ফেললে বছরের পর বছর তা এখানেই পরে থাকবে, কারণ তাতে সরকারের অনুমোদন নেই।

সাধারণ কাগজের মূল্য নেই, কিন্তু সরকার অনুমোদিত টাকা কাগজ হলেও মূল্যবান। সংবিধানে জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতির পিতার প্রতিকৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ আছে। একটি সাধারণ কাপড় যখন পতাকার রূপ নেয়, তখন তাকে বিশেষ মর্যাদায় রাখা হয়। একইভাবে, জাতির পিতার প্রতিকৃতি যখন একটি সাধারণ কাগজে ছাপানো হয়, তখন তাঁকে জাতির পিতার মর্যাদায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

আবার, কেবল একটি স্বাক্ষর বা অনুমোদনের কারণে সামান্য কাগজও মূল্যবান দলিল বা সম্পত্তিরূপে পরিগণিত এবং হস্তান্তরিত হয়।

এমনকি ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও অনুমোদন বা অর্পণের দ্বারা তার সমস্ত শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং, ভগবান যদি চান, তবে কি তিনি তাঁর নাম বা বিগ্রহে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করতে পারেন না? তদুপরি, ভগবান সমস্ত শক্তি, গুণ ও চিন্ময় বৈচিত্র্যের আধার এবং সম্পূর্ণ চিন্ময় হওয়ায় তাঁর নাম এবং বিগ্রহ তাঁর থেকে সর্বদা অভিন্ন।

□ আকৃতিভেদে জড় বস্তুর প্রতি আচরণের ভিন্নতা

স্বামীজি: এবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। আমরা কি সব জড় বস্তুকে একইভাবে মূল্যায়ন করি? নাকি তার আকৃতিভেদে মূল্যায়নেরও তারতম্য হয়?

আবির: হ্যাঁ। অবশ্যই আমরা ভিন্ন আচরণ করি।

স্বামীজি: যদি ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে নির্মিত কোনো বিগ্রহ কেবল ইট-কাঠ-পাথরই হয়, তবে কি আমরা সব ইট কাঠ পাথরে একইরকম আচরণ করি? না।

যেমন– একই সিমেন্ট, ইট, কাঠ দিয়ে শৌচাগার তৈরি করা হচ্ছে, আবার মন্দির বা মসজিদের গম্বুজ তৈরি করা হচ্ছে– এ দুইয়ের প্রতি আমরা কি একই আচরণ করবো? কখনোই না। কারণ, একই উপাদান হলেও অবস্থান বা আকৃতিভেদে এর ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে কাঠ-পাথর জড় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে কে সম্মান করে না?

সুতরাং, এটা কখনো বলা যাবে না যে, কাগজ, কাঠ বা পাথরকে কখনো সম্মান করা যাবে না। বরং, সুস্থমস্তিষ্ক এবং সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই আকৃতিভেদে এসব বস্তুকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেন। কারণ, এ প্রবৃত্তি জীবের আত্ম-অনুভূতিতেই রয়েছে।

ব্যক্তির ছবি বা ভাস্কর্য যেমন সেই ব্যক্তির প্রতিভূ, ভগবানের ছবি বা বিগ্রহ তেমনি ভগবানের প্রতিভূ। তাই তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানের মতোই সম্মান করার জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

□ স্রষ্টার প্রতিকৃতি নির্মাণের অর্থ স্রষ্টাকে নির্মাণ করা নয়

আবির: সৃষ্টিকর্তা সকলকে সৃষ্টি করেন, তাকে কীভাবে সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে?

স্বামীজি: ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের অতীত। অমাদের সীমিত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তাই ভগবান আমাদের তাঁর বিগ্রহের মাধ্যমে তাঁর আরাধনা অনুমোদন করেছেন। যখন প্রবাসী সন্তান পিতামাতার ছবি বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে তাঁদের স্মরণ করে; সেক্ষেত্রে **পিতামাতার প্রতিকৃতি সৃষ্টি বলতে নিশ্চয়ই পিতামাতাকে সৃষ্টি করা বোঝায় না?** পিতামাতার ছবিতে তারা থাকতে পারেন না। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, ভগবানের প্রতিকৃতিতে তিনি অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই আমরা ভগবানকে সৃষ্টি করি না, বরং ভগবান তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা সেই বিগ্রহে অধিষ্ঠিত হন।

□ বিগ্রহ বিষয়ে রামানুজাচার্যের শিক্ষা

বিগ্রহ বিষয়ে আচার্য রামানুজের খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে–

আচার্য রামানুজের কাছে একদিন এক মূর্তিপূজার প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন। তিনি আচার্যকে জিজ্ঞেস করেন, ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, তাঁকে পূজা করার জন্য আপনি ছোট ছোট কতগুলো পিতলের মূর্তি রেখেছেন কেন? আচার্য বললেন, আমার ধুনি জ্বালাবার জন্য আগুনের দরকার, আপনি গ্রাম থেকে আমাকে আগুন এনে দিন, তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব দিব। ঐ লোকটি একটি কাঠে আগুন নিয়ে উপস্থিত হলেন। আচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এক খণ্ড দগ্ধ কাঠ এনেছেন কেন? যা বলেছি তাই আনুন। আগুন বলেছি আগুন আনুন। আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। আপনার হাত ঘষে দেখুন, হাতের মধ্যেও আগুন আছে। আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি আগুন আনুন। পোড়া কাষ্ঠ চাই না। আচার্যের কথা শুনে লোকটি বললেন, অগ্নি সব বস্তুর মধ্যেই আছে, কিন্তু আপনার কাছে আনতে হলে কাষ্ঠ ছাড়া উপায় দেখি না। তখন আচার্য বললেন, সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত অগ্নিকে আমার কাছে আনতে হলে কাষ্ঠ ছাড়া উপায় দেখেন না– আমিও সেরূপ সর্বভূতস্থ সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মকে আমার নিকটে আনতে তাঁর শ্রীমূর্তি ছাড়া উপায় দেখি না। এটা আমারই অক্ষমতা। আপনার হাতের কাষ্ঠ আগে ছিল কাষ্ঠ, কিন্তু তাতে অগ্নি প্রজ্বলনের পর তা হয়ে উঠেছে অগ্নি, তেমনি আমার সামনের এ শ্রীবিগ্রহ এক সময় ছিল পিতল বা পিতলমূর্তি, এখন তা চিন্ময় পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রীনারায়ণ যেমন অযোধ্যা এসেছিলেন রাম রূপে, তিনি আজ আমার দুয়ারে এসেছেন অর্চা অবতার রূপে।

আচার্যের কথায় ঐ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সংশয়মুক্ত হলেন।

এমন উদাহরণ আরো দেয়া যায়, যেমন: জলীয় বাষ্পরূপে জল সর্বত্রই আছে, কিন্তু তাতে কারো তৃষ্ণা মেটে না, সে জল ধারণের জন্য পাত্র প্রয়োজন। তেমনি পরমব্রহ্ম অসীম ও সর্বব্যাপী হলেও বিগ্রহরূপে তিনি আমাদের কাছে ধরা দেন, আমাদের কৃপা করেন, এমনকি তাঁর সাথে আমাদের ভাবের বিনিময়ও হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, ঠিক যেমন আমরা টেলিফোনে কথা বলি। কিন্তু আমরা কি কেউ

টেলিফোনের সঙ্গে কথা বলি? না; বরং টেলিফোনের মাধ্যমে আরেকজনের সাথে কথা বলি। এভাবে একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ হয়। ঠিক তেমনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মাধ্যমে কেউ দেবতা বা ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

☐ মূর্তি, বিগ্রহ ও ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য

আবির: মূর্তি, ভাস্কর্য ও বিগ্রহের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

স্বামীজি: 'ভাস্কর্য' হলো বিভিন্ন জড় উপাদানে তৈরি শিল্পকর্ম। আর 'বিগ্রহ' হলো দেবমূর্তি বা দেহ। আর 'মূর্তি' শব্দের আভিধানিক অর্থ আকৃতি বা রূপ। সে অর্থে বিগ্রহ ও ভাস্কর্য উভয়ই মূর্তি। তবে, ভাস্কর্য ও সাধারণ মূর্তির সঙ্গে বিগ্রহের পার্থক্য রয়েছে। বিগ্রহ অর্থে বিশেষত দেবতার বা ভগবানের মূর্তিকে বোঝায়। সেবিত বা পূজিত বিগ্রহকে বলা হয় অর্চামূর্তি, অর্চাবিগ্রহ বা অর্চাবতার। **ধাতু, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদি দিয়ে যে কেউ কল্পনাপ্রসূত অথবা যেকোনো রূপের প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারে, সেটা এক প্রকার শিল্পকর্ম বা ভাস্কর্য; আবার কেউ হয়ত তার পূজাও করতে পারে, কিন্তু সেই প্রতিকৃতি কল্পনাপ্রসূত বা শাস্ত্রানুমোদিত না হওয়ায় তা বিগ্রহ আরাধনা নয়। সহজে বলা যায়, সব বিগ্রহ ও ভাস্কর্যই মূর্তি, কিন্তু সব মূর্তি বিগ্রহ নয়।**

সাধারণ একটা মূর্তি বা ভাস্কর্য জড় পদার্থের মতোই নিষ্প্রাণ। কিন্তু সনাতন শাস্ত্রে যেভাবে ভগবান বা দেবদেবীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে পূজা করার বিধান রয়েছে, তাতে কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে এঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন তা জড় বস্তু হলেও দিব্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন, আগুনের সংস্পর্শে লোহা আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়, চৌম্বকের সংস্পর্শে লোহা চৌম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ তামার তারে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন বিদ্যুৎ শক্তি থাকে বলে তা স্পর্শ করলে শক অনুভূত হয়। একটি সাধারণ সিলিকন ও প্লাস্টিকের তৈরি সিমকার্ড যখন মোবাইলে ঢুকানো হয় এবং অপারেটর কোম্পানি সিম কার্ডটি সচল করে দেয়, তৎক্ষণাৎ তা দূর-দূরান্তে কথা বলার শক্তি প্রাপ্ত হয়। জড় কিছু বস্তুতে যদি এমন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তবে

দিব্যগুণসম্পন্ন দেবদেবীগণ বা ভগবানের পক্ষে কি মূর্তিতে অবস্থান করা অসম্ভব? অবশ্যই নয়। শুদ্ধ ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আহ্বানে ভগবান বা দেবদেবীগণ দৈবশক্তিবলে সেই বিগ্রহে অবস্থান করেন। তখন তা আর সাধারণ কোনো মূর্তি থাকে না, তা হয় অর্চাবিগ্রহ। তবুও তোমার বোঝার সুবিধার্থে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্য ও অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহের পার্থক্য আমি আলাদা করে বলছি–

সাধারণ মূর্তি ও ভাস্কর্য	অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহ
সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্য হলো ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি পদার্থ দিয়ে তৈরি যেকোনো প্রতিকৃতি বা শিল্পকর্ম।	আট প্রকার উপাদান (ধাতু, কাঠ, পাথর, মাটি ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি ভগবান বা দেবদেবীগণের প্রতিকৃতিকে বিগ্রহ বলা হয়।
সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় না।	বিগ্রহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে এঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্যের রূপ কাল্পনিক অথবা ভৌতিক জগতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আদলে গড়া।	শ্রীবিগ্রহের রূপ বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে তৈরি করা হয়।
সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্য কেবলই অচেতন জড় পদার্থ।	অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহ জড় রূপে প্রতিভাত হলেও তা চিন্ময় (চেতনাময়)।
ভাস্কর্যের সাথে পূজা বা আরাধনার কোনো সম্পর্ক নেই। কেবল প্রদর্শনীর জন্য তৈরি করা হয়।	ভক্তের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের জন্য ভগবান নিজেকে বিগ্রহরূপে প্রকাশ করেন।
শিল্পীর মনগড়া অভিব্যক্তিকে রূপ প্রদান করে কোনো বিষয়কে ফুটিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।	প্রতিদিন অর্থাৎ নিত্য বিভিন্ন উপাচারে পূজার্চনা ও আরাধনা করাই বিগ্রহের উদ্দেশ্য।

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

রাধামাধব বিগ্রহ

চতুর্থ পর্ব

বৈদিক শাস্ত্রে বিগ্রহ আরাধনা

□ বিগ্রহ আরাধনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

আবির: শাস্ত্রে কি কোথাও বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা করার নির্দেশ রয়েছে?

স্বামীজি: নিশ্চয়ই। বৈদিকশাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ পূজা-পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁর আরাধনার নির্দেশ দিয়েছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৭/১০০/১) বলা হয়েছে–

নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশৎ।
প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্যমাবিবাসাৎ ॥

"যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় শ্রীবিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ স্তোত্র উচ্চারণের দ্বারা তাঁর পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন, তিনি মর্ত্যধন ইচ্ছা করে শীঘ্র প্রাপ্ত হন।"

যদি বিগ্রহ নির্মাণ শাস্ত্রানুমোদিত না হতো, তবে এখানে পূজা-পরিচর্যার প্রসঙ্গই আসতো না। বিগ্রহ সেবা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ভগবান বলছেন যে, "ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে উপাসকের হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেবরূপে আরাধনা করা।" ভগবানের এরূপ বিগ্রহ ৮ প্রকার উপাদান দ্বারা তৈরি হতে পারে।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ –ভা.১১/২৭/১২

অর্থাৎ "শিলা (পাথর), দারু (কাঠ), ধাতু, ভূমি (মাটি), আলেখ্য (চিত্র), বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।" এ অধ্যায়ের ২৪ নং শ্লোকে ভগবান বললেন, "উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে পরমাত্মাকে বিগ্রহের মধ্যে আহ্বান করে ভক্তের উচিত আমার আরাধনা করা।"

পদ্মপুরাণে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী...বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥* অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মন্দিরে অবস্থিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর মনে করে, সে নারকী অর্থাৎ সে নরকে বাস করছে।

আবির: তার মানে বৈদিকশাস্ত্রে ভগবান নিজেই বিগ্রহ আরাধনার অনুমোদন দিয়েছেন!

স্বামীজি: হ্যাঁ।

☐ বিগ্রহ ভগবানের করুণার প্রকাশ

স্বামীজি: এবার একটা গল্প বলি শোন– এক মায়ের একটি মাত্র সন্তান ছিল। অনেক বছর পর ভগবানের কৃপায় তার এ সন্তান লাভ হয়েছিল বলে তার প্রতি আদর-যত্নের কমতি ছিল না। প্রতিবছর ঘটা করে ছেলেটির জন্মদিন পালিত হতো। সেদিন ছেলেটি ভগবান এবং বাবা-মাকে ফুলের মালা পরাত। এভাবে বড় হলে এক সময় বাড়ির বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। এবার তার জন্মদিন আসার পূর্বে সে মাকে চিঠি লিখে, পরীক্ষার কারণে সে বাড়িতে আসতে পারবে না। মা খুব দুঃখ পান। ছেলের জন্য কতকিছু প্রস্তুত করেছেন অথচ কিছুই সে খেতে পারবে না! এদিকে ছেলেরও মন খারাপ। জন্মদিনে সে সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নানাদি সেরে ভগবানের চিত্রপটে পুষ্প-মাল্য নিবেদন করে। তারপর আরেকটি মালা হাতে মায়ের ছবির কাছে যায় মালা পরানোর জন্য। এমন সময় মা এসে উপস্থিত। দরজায় দাঁড়িয়ে মা দেখছেন– ছেলে মালা হাতে তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করতে করতে বলছে–

"মা, আমি জানি, তুমি আমায় অনেক ভালোবাসো। এবার আমি বাড়ি আসতে পারিনি বলে তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। তুমি আমায় ক্ষমা করো।" তারপর মায়ের ছবিতে মালাটি পরিয়ে দেয়। মা তা দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেন– "বাবা, তুই আমাকে এত ভালোবাসিস! এত সম্মান করিস!"

আগে ছেলে সরাসরি মাকে মালা পরাত, এবার মায়ের ছবিতে বা চিত্রপটে মালা পরালো– কোনটিতে মা বেশি খুশি হয়েছেন? মা বলেননি যে, "এটা তো ছবি, কাগজ, এটাতে কেন মালা পরাচ্ছিস?" বরং এটা তার নিষ্কপট ভালোবাসার পরিচয়।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিক স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ভগবান যেকোনো স্থানে অধিষ্ঠান করতে পারেন। তাহলে ভক্তের দ্বারা নির্মিত বিগ্রহে ভক্তের আহ্বানে কেন তিনি আবির্ভূত হবেন না?

আবির: কিন্তু ভগবান কেন বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হলেন?

স্বামীজি: পতিত জীব হওয়ার দরুন আমরা এ জগতের কেউই সরাসরি ভগবানকে দর্শন, স্পর্শন বা তাঁর সেবা করতে পারি না, কিন্তু আমাদের পরিশুদ্ধিতার জন্য ভগবানের সেবা করাও আবশ্যক। তাই ভগবান অত্যন্ত করুণা করে তাঁর অভিন্ন বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেন আমরা তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। বিগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা তা করতে পারি। বিগ্রহসেবা করতে করতে কারো চেতনা যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হবে, যখন সতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবার প্রতি আগ্রহী হবেন, তখন তিনি সরাসরি ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করবেন। ভগবানের অনুমোদিত বিগ্রহের সেবা করার ক্ষেত্রে ভক্ত বিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানেই সেবা করেন।

☐ বিগ্রহের অদ্ভুত লীলা

আবির: বিগ্রহ যদি সাক্ষাৎ ভগবান বা দেবতাই হন, তবে তাঁদের নিশ্চয়ই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে।

স্বামীজি: বিগ্রহ সাধারণত তাঁর অলৌকিকত্ব ভক্ত ব্যতীত প্রকাশ করেন না। তবু কখনো কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রকাশ দেখা যায়। যেমন:

☐ জড়ভরতকে রক্ষা

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, একসময় এক দস্যুসর্দার পুত্র কামনায় দেবী ভদ্রকালীর বিগ্রহের সামনে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে কল্পিতবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত আত্মতত্ত্ববেত্তা জড়ভরতকে নরপশুরূপে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। ভগবানের এমন মহান ভক্তের প্রতি এ অন্যায় আচরণ সহ্য করতে না পেরে দেবী ভদ্রকালী সহসা প্রতিমা বিদীর্ণ করে স্বয়ং প্রকাশিতা হলেন। ভয়ংকর উগ্রমূর্তি ধারণ করে বেদী থেকে নেমে এসে যে খড়গের দ্বারা দস্যুরা জড়ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়গ দ্বারাই সেই দস্যু ও তস্করদের মস্তক ছেদন করেছিলেন।

☐ জগন্নাথদেব ও বন্ধুমহান্তি

উড়িষ্যার যাজপুরে বন্ধু মহান্তী নামে জগন্নাথের এক পরম ভক্ত ছিলেন, যিনি জগন্নাথদেবকেই তাঁর পরম বন্ধু বলে মনে করতেন। দুই কন্যা ও এক পুত্রসহ অনুগত পত্নী নিয়ে তাঁর সংসার চলত ভিক্ষাবৃত্তি করে। একসময় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জগন্নাথের ওপর ভরসা করে মহান্তী তাঁর পরিবারসহ পুরী ধামে যান। তাৎক্ষণিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা জগন্নাথ মন্দিরের রান্নাঘরের ড্রেন থেকে ভাতের মাড় সংগ্রহ করে তা খেয়েই নিদ্রা যান। রাত্রিতে জগন্নাথবিগ্রহ স্বয়ং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর ভোজনের সোনার থালায় নানাবিধ সুস্বাদু প্রসাদ এনে বন্ধু মহান্তীসহ তাঁর পরিবারকে ভোজন করান, কিন্তু থালাটি রেখেই তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান। ভোজনের পর বন্ধু

মহন্তী ব্রাহ্মণকে দেখতে না পেয়ে থালাটি কাপড়ে মুড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন এই থালা চুরির দায়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভীষণ প্রহার করে। সেদিন রাতে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে এসে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে বলেন যে, "তোমার বাড়িতে অতিথি এলে তুমি কি তাকে না খাইয়ে রাখবে? তোমার প্রাসাদে এমন কেউ কি আছে যে না খেয়ে ঘুমিয়েছে? আমার বন্ধু তার পরিবার নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছে। তাকে আমি আমার সোনার থালায় খেতে দিয়েছি, তা কি তোমার পিতার সম্পত্তি? অথচ তোমার লোকজন তাকে কত না প্রহার করেছে। আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি এক্ষুণি পুরীর জেল থেকে তাদের সসম্মানে নিয়ে এসো, তাদের চরণ ধৌত করো, উন্নত বস্ত্র ও আভূষণ প্রদান কর এবং সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীকরূপে মাথায় মুকুট পরিয়ে দাও। আজীবনের জন্য তাদের উন্নত আহার ও বাসস্থানসহ সবধরনের ব্যবস্থা কর। অন্যথায় তোমার সবকিছু ধ্বংস করে দেব।" রাজাও ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।

☐ সাধক রামপ্রসাদ ও বামাক্ষ্যাপা

দেবী কালীর পরম ভক্ত রামপ্রসাদ ভারতবর্ষে অতি পরিচিত নাম। তিনি নিত্য কালীমাতার বিগ্রহের সেবাপূজা করতেন। একদিন রামপ্রসাদ শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে বাড়ির বেড়া বাঁধছিলেন। তখন দেবী কালী বিগ্রহ থেকে প্রকাশিত হয়ে একাকী রামপ্রসাদকে সহায়তা করেছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপাও ছিলেন তারামায়ের পরম ভক্ত, যিনি মায়ের বিগ্রহের নিত্য সেবা করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতেন।

☐ অন্যান্য

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য রেমুণায় গোপীনাথ বিগ্রহ নিজের আঁচলের নিচে ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাসকালে তাঁর অন্যতম ভক্ত গৌড়ীদাস পণ্ডিত যে গৌর নিতাই বিগ্রহের সেবা করেছিলেন তা স্বয়ংরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, খাবার গ্রহণ করেছিলেন এবং চলতে শুরু করেছিলেন।

এছাড়া, বংশীদাস বাবাজি, বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, মীরাবাঈ, গোবিন্দ ঘোষ, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণের জীবনীতে দেখা যায় যে, তাঁদের সাথে তাঁদের ইষ্টদেবরূপ শ্রীবিগ্রহের কত বিচিত্র লীলা সংঘটিত হতো!

পঞ্চম পর্ব

শ্রীবিগ্রহের নৈবেদ্য গ্রহণ

☐ বিগ্রহ কি আদৌ নৈবেদ্য গ্রহণ করেন?

আবিরঃ কিন্তু একটি বিষয় আমি বুঝতে পারছি না, যদি বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান বা দেবতাই হন, তবে আমরা পূজায় যে সকল নৈবেদ্য তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, তিনি কি তা গ্রহণ করেন? আর যদি গ্রহণই করেন, তবে ভোগপাত্র পূর্ণ থাকে কীভাবে? কীভাবে আমরা তা পুনরায় অন্যের মাঝে বিতরণ করি? সত্যিই কি তিনি ভোগ গ্রহণ করেন?

[ততক্ষণে স্বামীজির দুপুরের আহ্নিকের সময় হয়ে গেল। স্বামীজি তখন সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর টেবিলে রাখা একটি গ্রন্থ (ঈশোপনিষদ) থেকে "ওঁ *পূর্ণমিদঃ পূর্ণমিদং...*" শ্লোকটি আবিরকে মুখস্থ করতে বললেন।]

স্বামীজিঃ তুমি এই শ্লোকটি মুখস্থ করো, আমি আহ্নিক শেষ করে আসছি।

আবির শ্লোকটি মুখস্থ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর স্বামীজি ফিরে এসে বললেন–

স্বামীজিঃ তোমার কি শ্লোকটি মুখস্থ হয়েছে?

আবির চোখ বন্ধ করে খুব সুন্দরভাবে শ্লোকটি উচ্চারণ করল। স্বামীজি আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি কি সত্যিই শ্লোকটি যথাযথভাবে মুখস্থ করেছ?'

আবিরঃ হ্যাঁ। গ্রন্থে যেমন লেখা আছে, আমি ঠিক তেমনভাবেই মুখস্থ করেছি।

স্বামীজিঃ যদি গ্রন্থে লিখিত প্রতিটি শব্দ তুমি তোমার মনে ধারণ করে নিয়েছ, তাহলে সে শব্দগুলো (Words) এ গ্রন্থে এখনো কীভাবে রয়ে গেল?

তারপর তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করলেন– এ শব্দগুলো তোমার স্মৃতিতে আছে

সূক্ষ্মরূপে (অদৃশ্য রূপে) এবং এ গ্রন্থে আছে স্থূলরূপে (দৃশ্যমান রূপে)। একইভাবে, ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য সূক্ষ্মরূপে ভগবান গ্রহণ করেন এবং স্থূলরূপে তা অবিকৃত থেকে যায়; ঠিক যেভাবে যখন তিনি সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন স্থূলরূপে অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ (শূন্যস্থান)– এ পঞ্চমহাভূতের বিকারস্বরূপ জগতের সবকিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়কালে সবকিছু ধ্বংস হয়ে পুনরায় সূক্ষ্মরূপে তাঁরই মধ্যে প্রবিষ্ট হয় (গী. ৯.৭)। (এছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারতের শান্তিপর্বে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।) এভাবে, ভগবান নৈবেদ্য গ্রহণ করলেও তা পূর্ণরূপেই থেকে যায়।

তবে, ভগবান স্থূলরূপেও নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে তা পূর্ণ রেখে দেন, যেন আমরা প্রসাদরূপে তাঁর করুণা লাভ করতে পারি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শনকালে অর্জুনকে দেখিয়েছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও সমস্ত সৈন্যরা তাঁর মুখবিবরে প্রবেশ করছে (গীতা.১১/২৬-৩০)। অথচ, তখনও তারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু তা-ই নয়, অর্জুন এমনকি নিজেকেসহ সমগ্র জগৎ একত্রে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পান। এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য (আমাদের চিন্তার অতীত) শক্তির প্রভাব। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই সবাইকে নিহত করে রেখেছেন এবং একইসঙ্গে, অর্জুনকে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব দানের জন্য তিনি বাহ্যিকভাবে সবাইকে জীবিতও রেখেছেন (গী.১১.৩৩)। এটি অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা।

সুতরাং জীবদের প্রসাদ দানের করুণাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত নৈবেদ্য যে তিনি সম্পূর্ণ রেখেও গ্রহণ করতে পারেন, তাতে আর সন্দেহ কী!

এবার বল, তুমি ঈশোপনিষদ থেকে এইমাত্র যে শ্লোকটি মুখস্ত করলে, তার সার কথা কী?

আবিরঃ পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ।

[এরপর স্বামীজি তাঁর শিষ্যদের একটি কর্পূর ও রং মিশ্রিত জলপূর্ণ গ্লাস ও একটি খালি পাত্র আনতে বললেন। এসব আনার পর তিনি খালি পাত্রের উপর রঙিন-জলপূর্ণ গ্লাসটি রাখলেন এবং তাঁর কমণ্ডলু থেকে সেই গ্লাসে স্বচ্ছ-জল ঢালতে লাগলেন। উপস্থিত সকলে অবাক তাকিয়ে রইল। কমণ্ডলু থেকে নির্গত স্বচ্ছ জল গ্লাস প্রথমে ধারণ করছে, তারপর তা রঙিন

হয়ে খালি পাত্রে পড়ছে এবং পাত্রের সেই জল পুনরায় কমণ্ডলুতে ঢালার পর দেখা গেল, গ্লাস ও কমণ্ডলুতে পূর্বে যে পরিমাণ জল ছিল, এখনও সে পরিমাণ জলই আছে। অধিকন্তু কমণ্ডলুর জলও রঙিন ও কর্পূরের সুগন্ধযুক্ত হয়ে গেল।]

তখন স্বামীজি বললেন, এখানে জলপূর্ণ গ্লাস– পূর্ণ ভগবান, কমণ্ডলুর জল– নৈবেদ্য, কমণ্ডলু থেকে নির্গত জল গ্লাস প্রথমে ধারণ করার অর্থ ভগবান নৈবেদ্য গ্রহণ করেছেন এবং কমণ্ডলুর জলও রঙিন হওয়ার অর্থ, সে নৈবেদ্য তখন ভগবানের সংস্পর্শে তাঁরই মতো অপ্রাকৃত হয়ে গেল এবং সুগন্ধযুক্ত হওয়ার অর্থ, তাতে ভগবানের করুণা যুক্ত হলো।

এমন বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনার পর আবির অভিভূত হয়ে গেল। তার সন্দেহ দূরীভূত হলো। তবু আবিরের আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় করার জন্য স্বামীজি তাকে বললেন–

যখন কারো ছবি তোলা হয়– ধর, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, তখন কি ব্যক্তির শরীরের ঐ অংশটুকু বাইরে থেকে বিলীন হয়ে ক্যামেরায় প্রবেশ করে?

ভাবছ, "একি পাগলের প্রলাপ! ব্যক্তি তার জায়গায় একইরকম থাকে। অধিকন্তু, অবিকল তারই একটি চিত্র ক্যামেরা ধারণ করে।"

হ্যাঁ, শুধু ব্যক্তিই নয়, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদী-সমুদ্রসহ সমগ্র বিশ্ব ক্যামেরা নিজের মধ্যে ধারণ করে। ব্যক্তি বা বস্তু স্থূলরূপে বাইরে এবং সূক্ষ্মরূপে ক্যামেরায় অবস্থান করে। এভাবে অনেক ছবি তোলার পর এক সময় ক্যামেরার 'মেমরি ফুল' হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এ ছবিগুলো মেমরির জায়গা দখল করে, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ক্যামেরা ঐ ছবিগুলো (বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু) নিজের মধ্যে ধারণ করে।

তাহলে ভেবে দেখ, একটা সামান্য ক্যামেরা যদি মূল ব্যক্তি বা বস্তুকে অবিকৃত রেখেও সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে, তবে, সর্বশক্তিমান ভগবান কেন ভক্তের নিবেদিত নৈবেদ্য অবিকৃত রেখে গ্রহণ করতে পারবেন না?

আবির: কিন্তু তিনি কীভাবে এ নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, আমরা তো তা দেখতে পাই না?

স্বামীজি: আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জড়, ত্রুটিপূর্ণ এবং এদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, তুমি শুধু চোখ দিয়েই দেখতে পাও, তাও আবার সবকিছু দেখতে পাও না, কান ব্যতীত অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি কিছু শুনতে পাও না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত (জড়াপ্রকৃতির সৃষ্ট নয়) এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩২) বলা হয়েছে–

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি

অর্থাৎ তিনি তাঁর যেকোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য যেকোনো ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গণময্যাগুণা বিভুঃ ॥
(ভা. ১.২.৩০)

"এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।"

শ্রুতিশাস্ত্রেও সেকথা বলা হয়েছে– প্রশ্নোপনিষদে (৬.৩) *স ঈক্ষাঞ্চক্রে ॥* তিনি ইক্ষণ করলেন। *স প্রাণমসৃজত* (৬.৪)– তিনি প্রাণের সৃষ্টি করলেন। *তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥* (ছান্দোগ্য ৬.২.৩)। সৃষ্টির সঙ্কল্প করে পরব্রহ্ম মায়ার প্রতি ইক্ষণ বা দৃষ্টিপাত (তদ্ ঐক্ষত) করলেন। এই দৃষ্টিপাতের দ্বারাই তিনি সাম্যাবস্থাসম্পন্ন প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করে থাকেন, যার প্রভাবে মায়া জগতের সৃষ্টি আদি করে থাকে। আবার, কেবল তাঁর ইচ্ছার (মন-ইন্দ্রিয়) ফলেই সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়। একইভাবে, কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভগবান ভক্তের নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যদি তিনি তা করতে অসমর্থ হন, তবে সমগ্র জগতে তিনি কীভাবে সর্বশক্তিমান বলে কীর্তিত?

একটু গভীরভাবে চিন্তা করো আবির, ভগবানের নগণ্য এক সৃষ্টি– সামান্য সর্প যদি জিহ্বা দিয়ে শুনতে পারে, তবে তার স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান যে বিগ্রহরূপে দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভোগ গ্রহণ করতে পারবেন, এ আর এমন আশ্চর্যের কী? একইভাবে দেবদেবীরাও ভগবানপ্রদত্ত দিব্যশক্তির প্রভাবে কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা অথবা সরাসরি নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন।

আবির: ঈশ্বরের তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, তাঁর খাবারেরও প্রয়োজন নেই, তবে তাঁকে ভোগ নিবেদনের কী প্রয়োজন? কেনই বা তিনি তা গ্রহণ করবেন?

স্বামীজি: কূপমণ্ডুকেরা সবকিছুকে নিজের মতো মনে করে যেকোনো বিষয়কেই নিজের সাথে তুলনা করে। তারা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাকে যথার্থ বুঝতে না পেরে জানে না যে, ভগবান বা সৃষ্টিকর্তার দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল আমাদের মতো জড় নয়। তিনি যেমন অনন্তকাল অনাহারে থাকতে পারেন, তেমনি তাঁর অনন্ত ক্ষুধা হতে পারে এবং রাশি রাশি আহার গ্রহণ করতে পারেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তিনি আত্মারাম, যার অর্থ হচ্ছে তিনি আত্মতৃপ্ত। কিন্তু তবুও ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে এক অনন্য সম্পর্ক বিদ্যমান, যা সাধারণ জড় দৃষ্টি বা বিচারের অতীত।

ভগবান যদিও সবকিছুর মালিক তবুও ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভক্ত ভগবানকে সবকিছু নিবেদন করেন। যেমন, পত্নীর যদি কোনো উপার্জন না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পত্নী পতির ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু বিশেষ দিনে পত্নী পতিকে উপহার প্রদান করে, আবার পতিও পত্নীকে উপহার প্রদান করে। যদিও পত্নী তার পতির অর্থ থেকেই তাঁকে উপহার প্রদান করছে, তবুও পতি তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

আবার, ভগবান তাঁকে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন বিধায় তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞে বিভিন্ন দ্রব্য আহুতি দেয়ার নির্দেশ বেদে উল্লেখ রয়েছে। কেননা, *অসৃষ্টান্নম্...যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥*– (গী.১৭/১৩) অর্থাৎ, "প্রসাদান্ন বিতরণহীন যজ্ঞকে বলা হয় তামসিক যজ্ঞ।" যদি ভগবান ভোগ গ্রহণই না করেন, তবে এখানে প্রসাদের প্রসঙ্গ আসতো না।

ভগবানের নৈবেদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়বিহীন, ভগবদ্গীতার *(গী.৯/২৬)* এই শ্লোকটি তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের কাছে এটি কেবল রূপক অলঙ্কার মাত্র, অথবা তারা এটিকে গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে একজন সাধারণ মানুষ, তার প্রমাণ বলে মনে করে। কিন্তু যথার্থ সত্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। ইতোমধ্যে তা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যদি ইন্দ্রিয়বিহীন হতেন, তাহলে তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বলা হতো না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তিনি পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর শ্রবণ, ভোজন এবং স্বাদ আস্বাদন করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভক্তই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি ভগাবানের বর্ণনার কদর্থ করেন না, তাই

তিনি জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ভোগ আহার করেন এবং তার ফলে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন (গী.৯/২৬) যে, তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে অর্পিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, সেখানে আর সন্দেহ কী? জীবের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশানুসারে বিভিন্ন দেবদেবীরা সরবরাহ করছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর (গী. ৩.১২)।

এখানে উল্লেখ্য যে, দ্রব্যাদি প্রথমে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করতে হবে। কেবল তখনই দেবতারা ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করবেন এবং তারপর আমরা তা গ্রহণ করে ভগবানের করুণা লাভ করব।

☐ কোন কোন খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা যায়?

আবির: যেকোনো খাবারই কি ভগবানকে নিবেদন করা যায়?

স্বামীজি: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন– *যৎ অশ্নাসি...মৎ অর্পণম্ ॥* অর্থাৎ "তুমি যা আহার করো তা আমাকে অর্পণ করো"। তবে, যিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন, তিনি তাঁকে কেবল সেই জিনিসগুলোই অর্পণ করেন, যা তাঁর প্রিয়।

মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কখনোই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য নয়। কারণ, এগুলো রজো-তমোগুণ যুক্ত, কিন্তু ভগবান সর্বদা শুদ্ধসত্ত্বগুণে (নির্গুণ) স্থিত। যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে, এ সমস্ত দ্রব্য তাঁকে অর্পণ করা হোক, তাহলে তিনি সেকথা বলতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে–

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গী ৯/২৬)

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" আমরা যে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, ফল-মূল ও শস্যাদি গ্রহণ

করছি, তা ঐ পত্র, পুষ্প, ফল-মূলেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এসমস্ত দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করার পরই তাঁর প্রসাদরূপে আমরা তা গ্রহণ করি।

☐ ভগবৎ-প্রসাদের দিব্য গুণাবলি

আবির: ভগবানের প্রসাদ ও সাধারণ খাবারের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

স্বামীজি: নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩.১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–"ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট (ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ) অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।"

তাই, যেসমস্ত মানুষ পারমার্থিক উন্নতি এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী, তাদের পক্ষে এ প্রসাদান্নই আহার্য। কেউ যদি শাক-সবজির ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি অথবা অর্চা-বিগ্রহকে তা নিবেদন করে বন্দনাপূর্বক সেই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করার প্রার্থনা করে, তবে শ্রীকৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন এবং সে প্রসাদ কেউ গ্রহণ করলে তার জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়, দেহ শুদ্ধ হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলো সূক্ষ্ম হয়, যার ফলে পবিত্র, নির্মল চিন্তা করা সম্ভব হয়।

প্রসাদের দিব্য গুণাবলি কোনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে পাওয়া যাবে না, কেবল ব্যক্তিগত আস্বাদনের দ্বারাই তা উপলব্ধি করা যায়। তবে প্রসাদের দিব্য সুগন্ধ, স্বাদ এবং আস্বাদনের ফলে চিত্তের প্রশান্তি ও ধীরে ধীরে চেতনার উন্নয়ন থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, প্রসাদ সাধারণ খাবার নয়, তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়।

ভক্তরা অত্যন্ত প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ভোগ নিবেদন করেন। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির সবকিছুর একমাত্র অধিকারী, তাই আমাদের উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণ করার কোনো আবশ্যকতা তাঁর নেই; কিন্তু তবুও পিতা যেমন পরিবারের সবকিছুর মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারই অর্থে কেনা সন্তানের দেয়া প্রীতিপূর্ণ সমান্য উপহারও গ্রহণ করেন, তেমনি আমরা যখন পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করবার জন্য ভক্তিসহকারে তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করি, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন।

☐ বিগ্রহের ভোগ গ্রহণের কিছু বাস্তব ঘটনা

আবির: স্বামীজি, তবে কী ভগবান বিগ্রহরূপে সরাসরি কখনো ভোগ গ্রহণ করেন না?

স্বামীজি: নিশ্চয়ই করেন। সর্বশক্তিমান হওয়ায় তিনি তাও অবলীলায় করতে পারেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বলব না; বলব ভক্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিতে প্রীত হয়েই ভগবান ভক্তের সাথে বিগ্রহরূপে অনেক লীলা করেন।

আবির: তাহলে এমন কিছু লীলা (ঘটনা) বলুন–

☐ বৃন্দাবনের গিরিরাজ গোবর্ধন

স্বামীজি: তোমরা বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতের কথা শুনেছ। দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে লীলাবিলাসকালে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক সময় দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে ব্রজবাসীদের গোবর্ধন পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। গোবর্ধন শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, সেটি তাঁর পর্বতরূপী বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বিভিন্ন গ্রাম থেকে সমস্ত ব্রজবাসী নানারকম সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করে গোবর্ধনের পাদদেশে একত্রিত করেন এবং অত্যন্ত প্রীতি ও ভক্তিসহকারে সমস্ত নৈবেদ্য গোবর্ধনকে অর্পণ করা হয়। তখন সকলের সম্মুখে গোবর্ধন শ্রীকৃষ্ণের মুখাবয়ব বিশিষ্ট হয়ে নিবেদিত সমস্ত নৈবেদ্য সরাসরি গ্রহণ করেন। তখন থেকেই গোবর্ধন অভিন্ন কৃষ্ণরূপে জগতে পূজিত। সে ইতিহাস ব্রজবাসীদের মুখে আজও শোনা যায়।

☐ উড়িষ্যার আলালনাথ

ভারতের উড়িষ্যায় পুরীধামের সমুদ্রতীর থেকে দক্ষিণে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে, ব্রহ্মগিরিতে আলালনাথ নামে ভগবানের এক অপূর্ব বিগ্রহ বিরাজমান। এক সময় এ আলালনাথ বিগ্রহ এক ভক্তের অনুরোধে পায়েসান্ন ভোজন করেছিলেন। কিন্তু সে পায়েস ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত, সে অবস্থায় তা ভোজন করতে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের এক হাতের কিছু অংশ দগ্ধ হয়ে যায়। এখনো দেখা যায়, সেই চতুর্ভুজ বিগ্রহের এক হাত অন্য তিন হাতের

আলালনাথ বিগ্রহ

চেয়ে একটু আলাদা। এটি বিগ্রহরূপী ভগবানের লীলা।

আবির: ভগবানের হাত পুড়ে গেল, এ কেমন কথা!

স্বামীজি: ভগবান পরমাত্মা। জড় দেহের ন্যায় তিনি কখনো দগ্ধ হন না। তাই এটি ভগবানের এক লীলা মাত্র। ভগবান যে বিগ্রহরূপে তাঁর ভক্তের নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, তার প্রমাণস্বরূপ তিনি এমন কিছু অদ্ভুত লীলা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এটিও তাঁর সর্বশক্তিমত্তার একটি পরিচয়।

❑ পশ্চিমবঙ্গের গোপীনাথ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক পার্ষদ থাকতেন। তিনি তখন ছোট্ট বালক। একসময় তাঁর পিতা মুকুন্দ দাস বিশেষ কোনো কাজে বাড়ির বাইরে যাবেন বলে তাঁকে ডেকে গোপীনাথের ভোগ নিবেদন সেবার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু বালক রঘুনন্দন জানতেন না কীভাবে বিগ্রহকে ভোগ নিবেদন করতে হয়। তিনি নৈবেদ্য সাজিয়ে গোপীনাথের সামনে রেখে তাঁকে খেতে বলেন। কিন্তু গোপীনাথ খাচ্ছেন না দেখে শিশুমতি রঘুনন্দন কাঁন্না শুরু করেন। তখন বিগ্রহরূপী গোপীনাথ বাধ্য হয়ে সমস্ত নৈবেদ্য ভোজন করেন। পিতা মুকুন্দ ফিরে এসে রঘুনন্দনের কাছে যখন প্রসাদ চাইলেন, রঘুনন্দন বললেন, "গোপীনাথ তো সব ভোজন করেছেন। অবশিষ্ট নেই।" পিতা বিস্মিত হলেন। আরেকদিন তিনি বাইরে যাওয়ার ছল করে রঘুনন্দনকে সেবাভার দিয়ে তাঁর থেকে আড়াল হলেন। এবার রঘুনন্দন গোপীনাথকে লাড্ডু ভোগ দিয়েছেন। গোপীনাথের অর্ধেক লাড্ডু খাওয়া হলে মুকুন্দ দ্বারে এসে দেখে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ গোপীনাথ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।
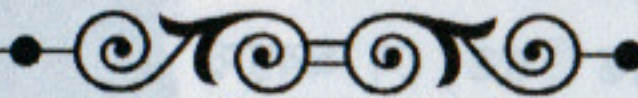
ষষ্ঠ পর্ব

বিগ্রহ আরাধনার আদর্শ পন্থা

❑ দুর্গাপূজার বর্তমান চিত্র

জগজ্জননীর সম্মুখে অপসংস্কৃতির বীভৎস রূপ

আবির: কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে পূজার যে চিত্র দেখা যায়, বিশেষত দুর্গাপূজা, কালীপূজা বা সরস্বতী পূজায়, তাতে কি আমরা আপনার বর্ণনানুসারে বিগ্রহ আরাধনার রূপ দেখতে পাই?

স্বামীজি: না, বর্তমান সময়ে এধরনের পূজা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ভক্তিচর্চার পরিবর্তে চলছে আচারসর্বস্ব সংস্কৃতির চর্চা। তা-ও ভালো হতো যদি সংস্কৃতিটা আদর্শ হতো; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তা ক্রমশ খারাপ হতে হতে অপসংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। পূজা নয়, যেন ডেকোরেশন আর লাইটিং-এর তুমুল প্রতিযোগিতা, উঠতি ছেলেমেয়েদের বিকৃত আনন্দ-উল্লাস। উগ্র শব্দে উগ্র গান চালিয়ে তারা মদ-গাঁজা খেয়ে অশালীন ভঙ্গিতে মায়ের সামনেই নৃত্য করে।

যেকোনো সাধারণ ভদ্রলোকও সে নৃত্য দেখে মুখ না লুকিয়ে পারবেন না, তা উপভোগ করা তো দূরের কথা।

অপসংস্কৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে বর্তমানে যারা এভাবে মায়ের পূজা করছে, প্রকৃতপক্ষে একে পূজা বলা যায় না। বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও এভাবে মায়ের পূজা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেউ কি নিজের মায়ের সামনে মদগাঁজা খেয়ে এভাবে অশালীন ভঙ্গিতে নৃত্য করতে পারে? যে কারো মা, এমনকি বোনের সামনেও যদি কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে মাতলামি করে, অশালীন ভঙ্গিতে নৃত্য করে, তবে তা কি কেউ সহ্য করবে? তাহলে যিনি জগজ্জননী, তাঁর সামনে কি এমন আচরণ করা যায়? এটা কখনো মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হতে পারে না। এটা জগন্মাতাকে অপমান করা। অতিথি যদি জানতে পারে যে, তাকে বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করা হবে, তবে কি তিনি সেখানে যাবেন?

এমনকি পারিবারিক বা সামাজিকভাবেও ভদ্রপরিবারে এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়। আর যদি তা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মন্দির, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই সবাই নির্মল পরিবেশ আশা করেন, সেখানে যদি এ ধরনের আচরণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা নিন্দনীয়।

ক'দিন আগে আমাদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী জনৈক পুলিশ অফিসার পূজামণ্ডপে কর্তব্যরত অবস্থার অভিজ্ঞতা বলছিলেন, "যখন সকালবেলা দেবীর পূজা হয়, দেবীকে ধূপ-দীপ, ফুল ইত্যাদি দেয়া হয়, তখন আমার মনেও এরকম পবিত্র পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু যখন সন্ধ্যা হতেই লাইটিং আর উগ্র গানের সাথে নাচবাজনা শুরু হয়, তখন এর প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা বরং ঘৃণা হয়।" প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চা হলে সবাই সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, কিন্তু তা বিকৃত হলে, সকলেই ঘৃণা করবে, এটাই স্বাভাবিক।

তাই যদিও শ্রীবিগ্রহের বহু গুণ-মহিমা শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে, তবু, যদি যথাযভাবে বিগ্রহকে মর্যাদা না দেয়া হয়, তবে সেখানে দেবী অবস্থান করতে পারেন না। মন্ত্রপাঠ করে যতই আহ্বান করা হোক, বিধি মোতাবেক মায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত না হলে মা কখনোই মূর্তির মধ্যে অধিষ্ঠান করবেন না।

আবির: আমি আপনার কথায় একমত। দেবীমাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়া না হলে, যথাবিধি পূজা না হলে মা কেন সেখানে অবস্থান করবেন? মা দুর্গা যদি সেখানে অবস্থান না-ই করেন, তবে তা অবশ্যই সাধারণ মূর্তিপূজা ছাড়া আর কিছু নয়।

☐ পূজা প্রকৃতপক্ষে কী?

স্বামীজি: 'পূজা' শব্দটি শোনা মাত্রই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে কোনো দেবপ্রতিমা বা ফুল-তুলসী-বিল্বপত্র ও শঙ্খ-ঘণ্টা দ্বারা সজ্জিত ধাতবপাত্র, আল্পনা, ঘট অথবা ধূপ-দীপ সমন্বিত আরতির দৃশ্য ইত্যাদি। তখন স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা অনুভব হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে পূজা মানে পার্টি, বিনোদন বা উৎসবমাত্র। আবার, কারো কাছে পূজা মানে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোর আর নতুন পোশাক পড়ে ঘোরাঘুরি, সমাবেশ অথবা আড্ডা দেয়া। প্রকৃতপক্ষে পূজার অর্থ তাদের হৃদয়ঙ্গম হয়নি বলা যায়। পূজার উদ্দেশ্য হলো পূজনীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি। এ আয়োজন তখনই পূজার অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে, যখন তা উপাস্যের সন্তুষ্টি বিধান করবে, উপাস্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাযুক্ত হবে। বৈদিক সংস্কৃতিতে এমন আয়োজনই স্বীকৃত। তাই পূজা মানে শুধু আচারসর্বস্বতা নয়, সেখানে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির সমন্বয় থাকতে হবে।

আবার, পূজা বলতে কেবলই শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে পুষ্পার্পণ নয়। 'পূজা' শব্দের বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ, যেমন– অর্চনা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, সম্মাননা বা সংবর্ধনা দেওয়াও বোঝায়, অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক কাউকে সম্মাননা বা সংবর্ধনা দেয়াও পূজা। সন্তান পিতামাতাকে, ছাত্র শিক্ষককে, অধঃস্তনও উর্ধ্বতনকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এটাই সভ্য সমাজের নীতি। দেশের পতাকাকে কে সম্মান করে না? যে তা না করে, তাকে সুনাগরিক বলে বিবেচনা করা হয় না। আবার, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে যখন মাল্যদান করা হয় অথবা অন্য যেকোনোভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাতেও প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পূজা করা হয়। শহীদদের উদ্দেশ্যে যখন পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, তাতেও নিশ্চয়ই শহীদের পূজা হয়। সুতরাং, প্রত্যেকেই কারো না কারো পূজা করছে এবং এভাবে পূজাকে কেউ ঘৃণার চোখে দেখছে না। কেননা, যোগ্যতা বিচারপূর্বক পূজা মহৎ কার্য; আর যে তা না করে, সে অকৃতজ্ঞ। এ কারণে, সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ কৃতজ্ঞতাবশত বিভিন্ন দেবদেবী এবং পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে থাকেন।

☐ কেমন হবে পূজা উদযাপন?

স্বামীজি: তবে, আধুনিকতার সংস্পর্শে সবাই যে অপসংস্কৃতির চর্চা করছে, তা কিন্তু নয়। এখনো অনেকে রয়েছেন, যাঁরা খুব শুদ্ধতা সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন।

আবির: তাহলে সঠিকভাবে দুর্গাপূজা করার ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়?

স্বামীজি: প্রথমত শাস্ত্রবিধি অনুসারে দেবীর বিগ্রহ তৈরি করতে হবে এবং সেই সাথে চাই প্রতিমাশিল্পী ও ব্রাহ্মণের শুদ্ধতা এবং সঠিকভাবে মন্ত্রপাঠ। পূজায় জাগতিক হিন্দি বা ইংরেজি গানের পরিবর্তে মায়ের বন্দনামূলক সংগীত বাজানো উচিত। পূজায় সাউন্ড সিস্টেমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মাকে তাঁর বন্দনা গীতি শোনানো, নিজেরা উগ্রভাবে নৃত্য করা নয়। ডেকোরেশন বা লাইটিং লোকের মনোরঞ্জন বা প্রতিযোগিতার জন্য নয়, মায়ের সন্তুষ্টি বিবেচনা করেই হওয়া উচিত। তাছাড়া পূজায় অবশ্যই শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। মদ্যপান ও সকল প্রকার নেশা বর্জন করা উচিত। অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন থেকে বিরত হওয়া উচিত। পূজাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজি যেন না হয়, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক পূজা কমিটির উচিত মায়ের সেবার গুণগত মান যেন নিশ্চিত হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা। এই নৃত্য, গীত, সাজসজ্জা, ভোজন ইত্যাদি বৈদিক সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও সবকিছুর উদ্দেশ্য উপাস্যদেবীর সন্তুষ্টিবিধানে হওয়া উচিত।

পূজার চাঁদার অর্থ ব্যক্তিস্বার্থে অথবা মদ-মাংসের পেছনে ব্যয় না করে, দেবতার উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা উচিত এবং পূজাবিধি আচরণের ক্ষেত্রে কারো মানসিক জল্পনা-কল্পনাকে গুরুত্ব না দিয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সবকিছু করা উচিত। কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম আসুরিক বলে গণ্য হয়। শাস্ত্রানুযায়ী কলিযুগে যজ্ঞে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেহেতু পশুকে পুনর্জীবন দান করা সম্ভব হয় না। তাই মাংসাহার, নেশা ইত্যাদি তামসিক আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জনপূর্বক শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাবে পূজা উদযাপন করা উচিত।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে।।

তামসিক যজ্ঞ উৎসবগুলো বিধিহীনম্– শাস্ত্রবিধি বর্জিত। *অসৃষ্টান্নম*– প্রসাদ বিতরণ করা হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েই আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করেন। যার ফলে মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে। অতএব, পূজাপার্বণে তামসিকতা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাবেই পূজা উদযাপন করা উচিত।

☐ পুরোহিতের কী কী যোগ্যতা থাকা উচিত?

আবির: পূজার পুরোহিতের যোগ্যতা কীরূপ হওয়া উচিত?

স্বামীজি: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।* "প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।" এবং স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে (গী.১৮/৪১)। ব্রাহ্মণের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাজম্ ॥ (গীতা. ১৮/৪২)

শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), তপ (তপস্যা), শৌচ (শুচিতা), ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা), সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য– এগুলো ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত গুণ বা কর্ম।

শূদ্রে চ তত্তবেল্লক্ষ্মা দ্বিজে চেচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
যত্রৈতল্লক্ষতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥
(মহাভারত, বনপর্ব ১৫১.২৫-২৬, যুধিষ্ঠিরবাক্য)

যুধিষ্ঠির বললেন, "শূদ্রে যদি এসকল লক্ষণ থাকে, তবে সে শূদ্রকুলোদ্ভূত হলেও শূদ্র নয়; আবার, ব্রাহ্মণের যদি লক্ষণ না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। যে পুরুষে এসকল গুণ দেখা যাবে, তিনি শূদ্রকুলোদ্ভূত হলেও তাকে ব্রাহ্মণ বলে জানবে এবং যে পুরুষে এসকল গুণ থাকবে না, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হলেও তাকে শূদ্র বলে নির্দেশ করবে।"

অর্থাৎ জন্ম অনুসারে নয়, গুণ এবং কর্ম অনুসারেই কারো বর্ণ নির্ধারিত হয়।

কিন্তু আজকাল পূজার ব্রাহ্মণ নির্বাচনে তা কি বিবেচনা করা হচ্ছে? ব্রাহ্মণ অবশ্যই চারটি পাপকর্ম যথা: আমিষাহার, নেশা, দ্যূতক্রীড়া (তাস, পাশা, জুয়া ইত্যাদি) এবং অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন করবেন। অর্থাৎ, প্রথমত তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। রজো-তমোগুণে আচ্ছন্ন অসংযমী ব্যক্তির ন্যায় তিনি নিশ্চয়ই ছাগ-মহিষের মুণ্ডু আর অর্ঘ্যাদির লালসায় কুশাসনে উপবেসন করবেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবেন তপস্বী, শুচি, সহিষ্ণু এবং সরলহৃদয়; শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী এবং ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ। অথচ, বর্তমান সমাজে যাদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করা

হয়, অধিকাংশই সাত্ত্বিক আহার করেন না, অধিকন্তু পূজামণ্ডপে প্রবেশের আগে না হয় পরে চা, পান, সিগারেট এসবের অন্তত কোনো একটির পূজা করে নেন। আর শাস্ত্রজ্ঞানের কথা কী বলব! অনেকে সঠিকভাবে মন্ত্রই উচ্চারণ করতে পারেন না। এখন তোমার কাছে প্রশ্ন, যথার্থ গুণযুক্ত না হলে, কেবল তোতা পাখির মতো মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারলেই কি কেউ পূজা করার অধিকারী হন? অথবা তাদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করেই বা কী লাভ? তাদের আহ্বানে কি পূজ্যদেব আবির্ভূত হন, নাকি সন্তুষ্ট হন? আমরা কোনো ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যথিত করতে চাই না, শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও যারা পৌরহিত্য করছেন, তারা যেন দয়া করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন হন এবং যারা পুরোহিত নির্বাচন করছেন, তারাও যেন যোগ্য ব্যক্তিকেই পূজাকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম না নিয়েও (এমনকি শূদ্রকুলেও) যদি কেউ ঐ গুণগুলো অর্জন করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ বলে বিদিত হবেন এবং তিনিই পূজা ও অন্যান্য বৈদিক সংস্কার কার্য সম্পাদনের অধিকারী।

আবির: স্বামীজি, আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেকে যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা-অনুষ্ঠান করেন, তাহলে মূর্তিপূজক, পুতুলপূজক ইত্যাদি বলে লোকে আর আমাদের নিন্দা করবে না। বরং প্রত্যেকেই শ্রীবিগ্রহের চরণকমলে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করবে।

☐ আরতি কেন করা হয়?

আবির: বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আরতি নিবেদনের সময় বিভিন্ন দ্রব্য নিবেদন দ্বারা কী বোঝানো হয়?

স্বামীজি: সাধারণত আরতি বলতে বোঝায় সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানসমূহ বিগ্রহরূপী ভগবানকে নিবেদন করা। ভগবদ্গীতায় (৭.৪-৫) বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড় জগৎ ভূমি, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ, মন, বুদ্ধি

ও অহংকার এই আটটি উপাদান দিয়ে তৈরি। এখানে ভূমি দ্বারা সমস্ত কঠিন, জল দ্বারা তরল, বায়ু দ্বারা বায়বীয়, আকাশ দ্বারা শূন্যমাধ্যম ও শব্দতরঙ্গ, অগ্নি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ ও শক্তিকে বোঝায়। আরতির সময় আমরা এই আটটি উপাদানের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভগবানকে নিবেদন করি। ফুল এবং বস্ত্র দ্বারা ভূমিকে, জল দ্বারা জলীয় বস্তুকে, প্রদীপ দ্বারা অগ্নিকে, চামর দ্বারা বায়ুকে, শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা আকাশকে, বিভিন্ন মন্ত্র ও কীর্তনের দ্বারা মনকে, আরতিতে পূর্ণরূপে সমর্পণের দ্বারা বুদ্ধিকে, প্রণাম দ্বারা অহংকারকে পূজারী শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে।

আবির: আরতির সময় দ্রব্যগুলোকে চক্রাকারে ঘুড়ানোর তাৎপর্য কী?

স্বামীজি: আরতির দ্রব্যসমূহ চক্রাকারে ঘুড়ানো হয়, কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কালের আবর্তে সর্বদা আমাদের সকল কার্যক্রম ভগবানকে কেন্দ্র করে সম্পাদন করা উচিত।

আবির: আরতি কেন করা হয়?

স্বামীজি: আমাদের যা কিছু আছে সবই ভগবানের। আরতি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত পঞ্চরাত্রের এমন একটি পন্থা যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি। যখন বিভিন্ন দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন ভগবান তা গ্রহণ করে প্রসাদ (কৃপা) রূপে আমাদের তা প্রদান করেন। তখন আমরা দীপশিখায় আমাদের হাত স্পর্শ করে, প্রসাদী পুষ্প আঘ্রাণ করে ও শঙ্খ জল শিরে ধারণ করে ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করি। এর দ্বারা ভগবানের প্রতি আমাদের সমর্পণ বৃদ্ধি পায়।

আবির: সত্যিই অসাধারণ। অথচ আমি এতদিন জানতামই না যে, আরতি সমর্পণের এত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আপনার ব্যাখ্যা আমাকে সত্যিই নতুন দৃষ্টি দিয়েছে।

☐ মূর্তি বিসর্জন

আবির: মূর্তি বিসর্জনের ব্যাপারে আমি কিছু জানতে চাই।

স্বামীজি: এ ব্যাপারে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৭/১৩-১৪) বলা হয়েছে– "সমস্ত জীবের আশ্রয় ভগবানের বিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন– ক্ষণস্থায়ী অথবা স্থায়ী। স্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করে আনার পর তাঁকে আর বিসর্জন দেয়া যায় না। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করা ও বিসর্জন দেয়ার সুযোগ থাকে।" পূজা সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে। একটি নিত্য পূজা, অন্যটি নৈমিত্তিক পূজা। ভক্তরা ভগবানের বা দেবদেবীর শ্রীবিগ্রহে নিত্য অর্থাৎ প্রতিদিন যে পূজা অর্চনা করেন, তা নিত্যপূজা। আবার, যখন কোনো বিশেষ নিমিত্তে বা তিথিতে ঘটে বা মূর্তিতে দেবদেবীকে আহ্বান জানানো হয়, তাকে বলা হয় নৈমিত্তিক পূজা। নিত্যসেবার বিগ্রহ কখনো বিসর্জন দেয়া যায় না। কিন্তু নৈমিত্তিক সেবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তিথি শেষে দেবী ঐ বিগ্রহ থেকে অপ্রকট হন এবং তাঁর বিগ্রহকে জলে বিসর্জন দেয়া হয়। তবে অবশ্যই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে বিসর্জন দেয়া উচিত।

☐ অনাচারেও মূর্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না কেন?

আবির: আচ্ছা, দুষ্কৃতকারীরা যখন বিগ্রহগুলো ভেঙে ফেলে, তখন তারা কেন কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না? তার অর্থ কি এই নয় যে, সেগুলো নিষ্প্রাণ?

স্বামীজি: যখন ভগবান কোনো জড় বস্তুর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি সাধারণত তাঁর দিব্যতা প্রকাশের দ্বারা জড় জগতের নিয়মের উলজ্ঘন করেন না, বরং এর দ্বারা তিনি তাঁর প্রতি আন্তরিক ভক্তগণের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ করেন। কিছু কিছু ধর্মাবলম্বী, যারা মূর্তিপূজা বা বিগ্রহ আরাধনার বিরোধিতা করে, তারাও কিন্তু তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। সেদিন আমি একটি ধর্মীয় লাইব্রেরিতে তাদের পবিত্র গ্রন্থ কিনতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো "আপনি অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করতে পারবেন না।" কেন? কারণ, তা পবিত্র, তাতে সৃষ্টিকর্তার বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ কাগজের বই হলেও তারা এটাকে সাধারণ বলে মনে করছে না। কিন্তু যারা এই গ্রন্থ পবিত্র বলে বিশ্বাস করে না, তারা কি এই গ্রন্থের পাতা ছিড়তে বা পোড়াতে পারবে না? অবশ্যই পারবে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা তো সৃষ্টিকর্তার বাণী, তিনি কেন তার বাণীরূপ পবিত্র গ্রন্থকে সুরক্ষা দিতে পারলেন না? আবার, ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের আরাধনার স্থান যাকে স্রষ্টার ঘর বলেও অভিহিত করা হয়; সেসমস্ত স্থানে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণ এবং চুরি-ডকাতির ঘটনাও শোনা যায়। তাদের স্রষ্টা যদি ক্ষমতাশালীই হন, তবে তার আরাধনাকক্ষে, সেখানকার দানবাক্স তালাবদ্ধ করে রাখার কী আবশ্যকতা; নিরাপত্তাকর্মী রাখারই বা কী আবশ্যকতা। তাছাড়া বহু নাস্তিক হামেশাই স্রষ্টার নিন্দা করছে– তাদের তো তাৎক্ষণিক কিছুই হচ্ছে না! তার অর্থ কি এই যে, তাদের কোনো শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা স্রস্টার নেই? বিগ্রহের প্রতিক্রিয়া বা অবজ্ঞাকারীর শাস্তি তাৎক্ষণিক না হওয়ার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, বিগ্রহ নিষ্ক্রিয় বা নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, তবে এসব ক্ষেত্রেও কী বলা হবে, "স্রষ্টা কেন তাঁর ঘর, অর্থসম্পদ রক্ষা করতে পারেননি? তিনি কেন সেই ব্যক্তিদের তৎক্ষণাৎ কোনো শাস্তি প্রদান করলেন না? নিশ্চয়ই তার কোনো ক্ষমতা নেই।"

স্রষ্টা প্রতিবাদ না করলেও এর দ্বারা পবিত্র গ্রন্থের বা আরাধনার স্থানের দিব্যতা নষ্ট হয়ে যাবে না। কারণ, এই গ্রন্থের দিব্যতা এই গ্রন্থ পোড়ানো বা ছিড়ে ফেলা হতে সুরক্ষা দেয়ার মধ্যে নিহিত নয়, বরং শ্রদ্ধাসহকারে এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে এর জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই এই গ্রন্থের দিব্যতা প্রকাশিত হয়। বিগ্রহের ক্ষেত্রেও একইরকম। তারা যেমন একটি সাধারণ কাগজের বইকে দিব্য বলে মনে করে, কারণ, তাতে সৃষ্টিকর্তার বাণী লিপিবদ্ধ আছে, আবার, সাধারণ ইট, বালি, সিমেন্টের ঘরকে স্রষ্টার ঘর বলে মনে করেন, তেমনি ভক্তগণের কাছে বিগ্রহ সাধারণ জড় বস্তু দিয়ে নির্মিত হলেও তা ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছে। ভক্তিসহকারে বিগ্রহের আরাধনার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়।

আবির: তবে এখানে একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়, গ্রন্থ থেকে তো জ্ঞান আহরণ করা যায়, কিন্তু বিগ্রহের মাধ্যমে কি তেমন কিছু পাওয়া যায়, যা দ্বারা আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা উপলব্ধি করতে পারি?

স্বামীজি: মনে করো, এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরক্ষর, সে লেখাপড়া জানে না। তাকে যদি কোনো বই পড়তে দেয়া হয়, তবে কি সে তা পড়তে পারবে? না। কেন? কারণ, তার এই বিদ্যা জানা নেই। বই তার কাছে কয়েকটি কাগজের টুকরার সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ব্যক্তি যখন কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখবে যে, শত শত লোক বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে। তার কাছে মনে হবে, কী আছে এতে যে, তারা এটা পড়ে কখনো হাসছে, আবার কখনো মুখ গোমড়া করে আছে।

কেন তার এমন মনে হবে? কারণ, তার পড়ার কোনো জ্ঞান নেই। এ বইগুলো তার কাছে কেবল কাগজ। অথচ, শত শত পাঠক এই বই পড়ে আনন্দ বেদনার অনুভূতি লাভ করছে। ঠিক তেমনি, যারা বিগ্রহ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের কাছে মন্দিরে গেলে মনে হবে, আরে তারা কি করছে, সাধারণ পাথর আর ধাতব মূর্তির সামনে তারা কেন সারাদিন সময় নষ্ট করছে। কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহের মহিমা সম্বন্ধে অবগত, তারা বিগ্রহের সাথে তাদের ভাবের আদান প্রদান করতে পারেন, যা ঠিক নিরক্ষর ব্যক্তির মতো অজ্ঞ লোকদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

মূর্তির প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে আরেক দিক থেকে বলা যায়, জড়া প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজো ও তম) ত্রিগুণের দ্বারা মোহাচ্ছান্ন হয়ে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়– *প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জতে গুণকর্মসু (গী. ৩/২৯)*। রজো ও তমোগুণের প্রভাবে সামান্য কারণে তারা ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এ ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে। তাই তিনি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে মূর্খের ন্যায় আচরণ করেন না। তিনি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করেন এবং যথাসময়ে উপযুক্ত দণ্ড দান করেন। যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ মার্জনা করেছিলেন এবং তার অপরাধের সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি সুদর্শন চক্র দ্বারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। এমনকি এখনো আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ শিশুপালের মতো কত ব্যক্তি, কত নাস্তিক হামেশাই ভগবানের নিন্দা করছে; তাই বলে কি ভগবান তৎক্ষণাৎ এসে তাদের নিধন করছেন? না। তার অর্থ কি এই যে, পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই? যদি তা-ই হতো, তবে পৃথিবীতে নাস্তিক বা ভগবৎ-বিদ্বেষী বলে কেউ থাকত না, যেহেতু তারা তৎক্ষণাৎ সৃষ্টিকর্তার হাতে নিহত হতো অথবা বলতে হতো পরমেশ্বর বলে কেউ নেই। প্রকৃতপক্ষে, যথাসময়ে তারা এর দণ্ড পাচ্ছে। বিগ্রহকে অবমাননা করার ফলস্বরূপ বহু ব্যক্তিকে আমরা দণ্ড পেতে দেখেছি এবং শুনেছি। সুতরাং, বিগ্রহ ভাঙ্গার ফলে এর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে অপরাধী তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত না হওয়াই প্রমাণ করে না যে, বিগ্রহ সাধারণ জড় পদার্থের মতো নিষ্প্রাণ।

☐ বিগ্রহ অবমাননাকারীর শাস্তি

আবির: তাহলে বিগ্রহভাঙার ফলে তারা কি কোনো শাস্তি পাবে না?

স্বামীজি: হ্যাঁ, আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে, যথাসময়ে এর শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে। কেননা, তারা মহা অন্যায় করছে। ধর্মের প্রতি অবমাননা করার কথা কোনো ধর্মেই বলা হয়নি। কারণ, মতাদর্শ ভিন্ন হলেও প্রত্যেক ধর্মের মূল একজনই। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্র– "প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" অবশ্যই কার্যকর হবে। তাই তারা যে ক্রিয়াটি করছে, তারও ফল তাদের ভোগ করতেই হবে– এখন, না হয় ভবিষ্যতে। আমরা সব কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ পাই না। যেমন কেউ যদি বিষ খায়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে, আবার, যদি কেউ ধূমপান, মদ্যপান বা নেশা করে, তবে ধীরে ধীরে তার মৃত্যু ঘটে। কিছু পরীক্ষার ফল আমরা দু-একদিনের মধ্যে বা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাই, আবার কিছু পরীক্ষার ফল অনেক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পেয়ে থাকি। ঠিক তেমনি, ভগবান সবকর্মের ফল তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন না। অবশ্যই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল লাভ করবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৭/৫৪-৫৫) বলা হয়েছে– "নিজে অথবা অন্য কারো প্রদত্ত দেবতা অথবা ভগবানের ভক্তের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বছর বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে। কেবল সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সে কুকর্মে প্ররোচিত করবে অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জন্মে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই পরিমাণে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।" এবার ভেবে দেখ, যদি বিগ্রহ বা তাঁর সামগ্রী চুরির জন্য এরূপ শাস্তি হয়, তবে তা ভাঙার জন্য তাদের কীরূপ শাস্তি হতে পারে!

সপ্তম পর্ব
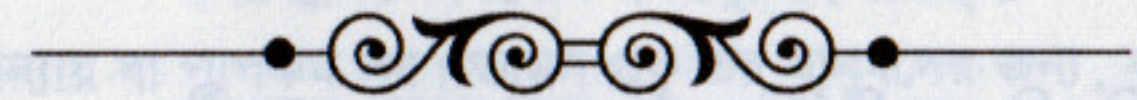
পূজায় বলিদান প্রসঙ্গ

☐ দেবীপূজায় পশুবলি কি শাস্ত্রসম্মত?

আবির: স্বামীজি, আরেকটি বিষয়, প্রায়ই আমরা দেখতে পাই কালীপূজায় বা দুর্গাপূজায় বিশেষত কালীপূজায় পশু বলি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে কী বলা হয়েছে?

স্বামীজি: বেদে উল্লেখিত যজ্ঞে পশুবলির দোহাই দিয়ে দুর্গা, কালী, মনসা প্রভৃতি দেবীপূজায় প্রাণিহত্যা আর মদ-মাংস খাওয়ার প্রতিযোগিতা আজ তথাকথিত সনাতন সংস্কৃতির রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলিযুগের ধর্মভ্রষ্ট, উগ্র ও পিশাচগুণসম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের তামসিকতার অনুকূলে উগ্ররূপা কালী-মূর্তির আরাধনা করে এবং মাংসলোলুপতা চরিতার্থ করতে পশুবলি দেয়। তারা কালী-দুর্গাকে বৈষ্ণবীরূপে না দেখে রক্তপায়ী রূপেই দেখে। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন (ভা.৫/৯/১৮-তাৎপর্য), "আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীপূজা করে। কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। বস্তুত, প্রতিমার সম্মুখে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।" কেননা, দেবীদুর্গা জগজ্জননী এবং কালীসহ অন্যান্য দেবীগণ সেই মাতৃস্বরূপেরই বিভিন্ন প্রতিমূর্তি। জগতের সমস্ত জীবই তাঁর সন্তান। মাতা হয়ে এক সন্তানের দ্বারা অপর সন্তানের বধ তিনি কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন?

☐ বেদোক্ত পশুবলির কারণ ও উদ্দেশ্য

আবির: পশুবলি যদি বেদ নির্ধারিত হয়, তবে তাতে দোষ কী?

স্বামীজি: বেদে নির্ধারিত সব আচরণ বিধি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। সত্ত, রজো ও তমো – এ ত্রিগুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির জন্য আচরণ বিধিও ভিন্ন

ভিন্ন। বেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গের কথা বলা হয়েছে। যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে সরাসরি নিবৃত্তির পন্থা গ্রহণে অসমর্থ, সেসব প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে শাস্ত্রে কিছু নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুমোদন রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৩) বলা হয়েছে– "মদ্যপানের পরিবর্তে মদের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণ, যথেচ্ছা পশুবলির পরিবর্তে যজ্ঞে পশু ব্যবহার, ইন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্তে শুধু সন্তান উপাদনের জন্যই মৈথুন কার্য বিহিত। কিন্তু স্বেচ্ছাচারীরা এমন বিশুদ্ধ স্বধর্ম অবগত হয় না।" তাই তারা নির্বিচারে প্রাণিহত্যারূপ পাশবিক কর্মে লিপ্ত হয়।

মহাভারতে শান্তিপর্বের ২৬৫নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের বিচখ্যুনৃপ সংবাদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "অহিংসাই সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেসকল মানুষ যজ্ঞে পশু হত্যা করে বৃথা মাংস ভোজন করে, তাদের সে কর্ম নিন্দনীয়। ধূর্তরাই মদ, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদে নির্বিচারে এসব ভক্ষণের বিধি নেই। বস্তুত, কাম, লোভ, মোহবশতই লোকদের এসব অমেধ্য দ্রব্যে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।"

প্রকৃতপক্ষে, বলি কথাটির অর্থ হলো বিসর্জন বা উৎসর্গ, কেবল পশুহত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ নয়, বরং পশুকে নিমিত্ত করে কাম, ক্রোধ, লোভাদি হৃদয়ের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে বিসর্জন দেয়া। তাছাড়া, বৈদিক যজ্ঞ কোনো সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। বৈদিক আচারসম্পন্ন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের আহ্বানে যজ্ঞে স্বর্গের দেবতারা অংশগ্রহণ করতেন, যজ্ঞবিধি অনুসারে কখনো কখনো যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়া হতো। কিন্তু এই প্রকার পশুবলি মাংসাহারের জন্য নয়, পক্ষান্তরে বৃদ্ধ পশুকে নতুন ও উন্নত জীবন দান করার জন্য এবং বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য। কখনো কখনো গবেষণাগারে ছোট ছোট পশুদের ওপর ঔষধের প্রভাব পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলে পশুদের মৃত্যু হয়। ওষুধের গবেষণাগারে পশুরা পুনরুজ্জীবিত হয় না, কিন্তু মনুসংহিতায় (৫/৪০,৪২) বলা হয়েছে যে, যজ্ঞস্থলে বলিকৃত পশু বৈদিক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে পুনরায় উন্নত দেহ লাভ করে–

যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রি তীঃ পুনঃ ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুমাং গতিম্ ॥

তাই তা অন্যায় বা পাপকর্ম নয়। তামস প্রকৃতির মানুষদের জন্য, যাদের মাংস না খেলে চলেই না, তাদের জন্য শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে, অমাবস্যার গভীর রাতে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে মহামায়া দুর্গার উগ্ররূপা কালীমূর্তির সামনে একটি পাঁঠাকে বলি দিয়ে

তার মাংস ভক্ষণ করা। তবে এতে যে তাদের কোনোই পাপ হয় না, তা নয়। পশুরা মাংসাশী হলেও তাদের পাপ হয় না। কিন্তু মানুষ পশু নয়। তাই মহাভারত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ব্রাহ্মণের অনুমতি সাপেক্ষে এরূপ তামসিক যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস ভক্ষণে পাপ কম হয়। কিন্তু শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যখন তখন নিরীহ পশুদের বধ করে তাদের মাংসভক্ষণ শাস্ত্রে কোথাও অনুমোদিত নয়।

তদুপরি, মানুষ যেন নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যখন তখন নিরীহ পশুদের হত্যা করে মহাপাপের ভাগী না হয় এবং সেই সাথে ধীরে ধীরে তাদের পারমার্থিক উন্নতি হয় এবং সর্বোপরি মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই শাস্ত্রের এই বিধান। যেমন, কেউ যদি সিগারেটের প্রতি অত্যধিক আসক্ত থাকে, তবে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার হয়ত প্রথমাবস্থায় তাকে সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ত্যাগ করতে বললে তার পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই কারো যদি দৈনিক এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তবে তাঁকে প্রথমাবস্থায় পাঁচটি, তারপর তিনটি বা দুটি সিগারেটের অনুমোদন দিতে পারে। যাতে ধীরে ধীরে তিনি সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন।

সুতরাং, এমনকি মা কালীর সম্মুখে মাসে একবার যে বলির বিধান, তাও মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই অনুমোদিত। মনুসংহিতায় যে স্থলে মাংসভক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চরম সিদ্ধান্তস্বরূপ ৫ম অধ্যায়ের ৫৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারতাদি শাস্ত্রেও সেকথা বলা হয়েছে। মহাভারতে (অনুশাসনপর্ব ১১৫ অধ্যায়) বলা হয়েছে, "পূর্বকালে যাজ্ঞিকগণ পূণ্যলোকলাভে অভিলাষী হয়ে ব্রীহিসমুদয়কে (ব্রীহি=ধান) পশুরূপে কল্পিত করিয়া তা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। একসময় ঋষিগণ মাংসভক্ষণ বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হয়ে চেদিরাজ বসুর নিকট গমনপূর্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এ প্রশ্ন করলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। সে অপরাধের জন্য তাকে স্বর্গচ্যুত হয়ে ধরাতলে এবং পরে পাতালে প্রবেশ করতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করেন, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তার শ্রেয়।" মনুসংহিতায় (৫/৫৬) বলা হয়েছে,

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিং তু মহাফলা ॥

অর্থাৎ মাংসাহার, মদ্যপান এবং মৈথুনাচার বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এধরনের কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হলে তা এতটা দোষাবহ নয়, তবুও এগুলো থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।

অতএব, শাস্ত্রসমূহ রজো-তমোগুণাচ্ছন্ন লোকদের মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণীহত্যা আপাত অনুমোদন দিচ্ছে মনে হলেও, পরোক্ষভাবে সকলের জন্য তা নিষিদ্ধই করা হয়েছে।

☐ কলিযুগে বলিদান নিষিদ্ধ

এ কলিযুগে পশুদের নবজীবন দান করার মতো শক্তিশালী ব্রাহ্মণ নেই বললেই চলে। তাই কলিযুগের জন্য এসমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (কৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ড ১৮৫/১৮০) বলা হয়েছে– *অশ্বমেধং গবালম্ভং ......কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥* অর্থাৎ– "অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ...কলিযুগে নিষেধ।" তাই কলির প্রারম্ভে বুদ্ধদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান নিজেই জগতে অহিংসা ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস প্রায় সবার জানা।

অষ্টম পর্ব
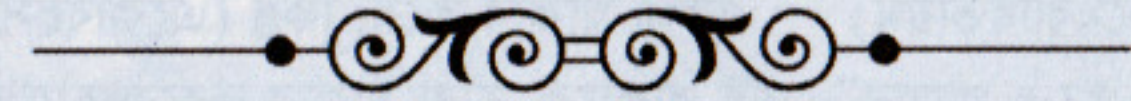
ভগবান ও দেবদেবী

ভগবান ও দেবদেবীর সম্পর্ক

আবিরঃ আচ্ছা স্বামীজি, দেবদেবীদের সাথে ভগবানের সম্পর্ক কী? আমরা কী একেশ্বরবাদী নাকি বহু-ঈশ্বরবাদী?

স্বামীজিঃ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়– *একমেব অদ্বিতীয়ম্*। সেই এক পরমেশ্বর ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণু আদি সমস্ত অবতারগণ তাঁরই স্বাংশ প্রকাশ। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার ৫ম অধ্যায় (২০/২) এ বলা হয়েছে– "যাঁর ত্রিবিক্রমে সমস্ত প্রাণী বাস করে, সিংহের ন্যায় যিনি ভয়ংকর, মৎস্যাদি বিভিন্ন রূপে যিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা, বেদবাণীতে অথবা জীবদেহে অন্তর্যামীরূপে যিনি বিরাজমান, সে বিষ্ণু স্বমহিমায় সকলের দ্বারা স্তুত হন।"

অভিনয় জগতে একই ব্যক্তি বিভিন্ন রূপে নিজেকে উপস্থাপন করে, তেমনি, *রামাদি মূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠান (ব্রহ্মসংহিতা-৫/৩৯)*– পরমেশ্বর যদিও এক, তথাপি লীলা বিস্তারের জন্য তিনি রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, বরাহ ইত্যাদি বহু রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন (একোবহুস্যাম)। কিন্তু নির্বোধেরা এসমস্ত রূপকে এক ভগবান থেকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে। তারা "পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়"(একমেবাদ্বিতীয়ম্) – একথা স্বীকার করে; কিন্তু (একোবহুস্যাম) "তিনি এক হয়েও বহু হতে পারেন"– এই বাক্যকে তারা স্বীকার করতে চায় না। এভাবে মূর্খরা একেশ্বরকে যথার্থ জানতে না পেরে তাঁর অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করে। একই ব্যক্তি যদি অনেক প্রকার আয়নার সামনে দাঁড়ান, তবে তিনি নিজেকে বহু রূপে দেখবেন– কোনোটিতে খাটো, কোনোটিতে লম্বা, কোনোটিতে ছোট, আবার কোনোটিতে বড় ইত্যাদি। তবু তারা অভিন্ন বা একই ব্যক্তি। আবার, সূর্য অসংখ্য জলাশয়ে পৃথকরূপে প্রতিবিম্বিত হলেও এক। তবে, প্রতিবিম্বিত বস্তুর কার্যাবলি একই রকম হয়, কিন্তু সর্ব শক্তিমত্তাহেতু পরমেশ্বর এক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য করতে সমর্থ। সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, "না, তিনি কখনো বহু রূপ ধারণ করতে পারেন না" তবে তাঁকে সীমিত এবং অপমান করা হয়। তাই তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও আমরা একেশ্বরবাদী; আর দেবদেবীরা হচ্ছেন এক পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। ঋগ্বেদ-সংহিতায় (৭.৪০.৫) বলা হয়েছে– **"অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্য দ্বারা প্রাপনীয় অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ।"** তাঁরা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সৃষ্ট এ জড়াপ্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেন। যেমন, ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করেন, ইন্দ্র বৃষ্টি, বরুণ জল, অগ্নিদেব অগ্নি, পবনদেব বায়ু, সূর্যদেব সূর্যকে পরিচালনা করেন এবং তা দেশের সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের ন্যায়। ভগবানও প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোকে দেবদেবীদের দ্বারা পরিচালনা করেন । দেবদেবীরা আমাদের পূজনীয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কেবল অমাদের নয়, এমনকি দেবদেবীগণেরও আরাধ্য। কারণ, দেবদেবীগণ সকলে ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ হিসেবে জগৎ পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন। সুতরাং, দেবদেবীগণ ভগবানের সমকক্ষ নন, তবু তারা সম্মানীয়।

সনাতন ধর্মে একেশ্বরের আরাধনার যে নির্দেশ রয়েছে তা সত্য। কিন্তু সেই এক পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভের জন্য তাঁরই অনুগত দেবতাদের কৃপা প্রার্থনা এবং তাদের পূজা বা সম্মান করা যাবে না, তা অযৌক্তিক। যেমন, প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধান। তিনি সকল জনগণের সম্মানীয় বা পূজনীয়। তাই বলে অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্মান করা যাবে না, তা রাষ্ট্রের কোনো আইনে নেই। বরং, কেউ যদি কেবল প্রধান মন্ত্রীকে সম্মান করে, আর তাঁর অনুগত অন্যান্য মন্ত্রীদের অসম্মান বা অপমান করে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।
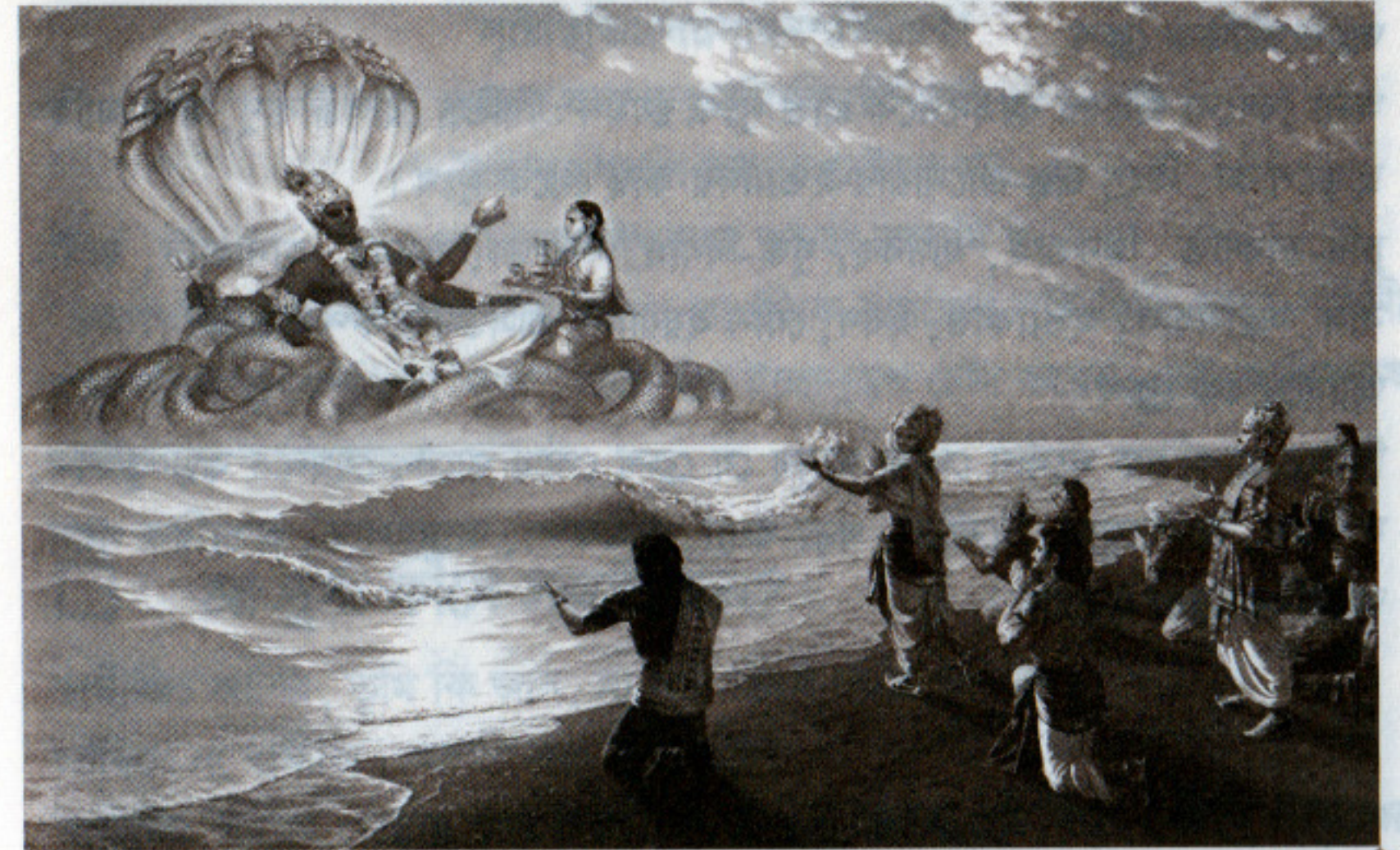
☐ দেবী দুর্গার পরিচয়

আবিরঃ দুর্গাদেবী কে? তাঁর সাথে ভগবানের সম্পর্ক কী?

স্বামীজিঃ *দেবী দুর্গা সম্পর্কে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে–*

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

অর্থাৎ "যে দেবী সর্বভূতে (সর্বজীবে) বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে বারংবার নমস্কার।"

সুতরাং, দেবী দুর্গা হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তির প্রকাশ। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছি বিধায় শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য সত্ত্ব, রজো ও তম–এ তিনগুণের দ্বারা এ জড় জগৎরূপ দুর্গ বা কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

তিনি মহিষাসুরকে যেরূপ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন, তদ্রূপ আসুরিকভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আধি-আত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক– এ তিন প্রকার ক্লেশ প্রদান করেন; যার প্রতীকরূপে দেবী দুর্গার হাতে ত্রিশূল দেখা যায়। এভাবে তিনি আমাদের দুঃখ প্রদান করছেন।

আধ্যাত্মিক ক্লেশ

জড়দেহ ও মন থেকে উৎপন্ন দুঃখ, যেমন : ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-ভয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, মানসিক যন্ত্রণা-উদ্বেগ ইত্যাদি।

আধিভৌতিক ক্লেশ

অন্য কোনো জীবের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ; যেমন : বিভিন্ন রোগজীবাণু, মশা-মাছি-ছাড়পোকা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদির কাছ থেকে দুঃখ।

চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, হ্যাকিং, যুদ্ধ-বিবাদ, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, হানাহানি, জঙ্গী-বাদ, সন্ত্রাসবাদ, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি।

আধিদৈবিক ক্লেশ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষ যে ক্লেশ পেয়ে থাকে; যেমন : ঝড়-তুফান, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, খড়া-বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, অত্যধিক গরম, অত্যধিক ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

☐ দেবী দুর্গার দুই প্রকার কৃপা

আবিরঃ তবে কি দেবী দুর্গা আমাদের কেবল দুঃখই প্রদান করেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন আমরা তাঁর পূজা করি?

স্বামীজিঃ না, দেবী দুর্গা আমাদের দুঃখ এবং সুখ উভয়ই প্রদান করেন। জেলার যেমন কয়েদীকে দুঃখ দানের মাধ্যমে সংশোধন করেন এবং কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন, তেমনি বদ্ধজীবদের দুঃখ দানের মাধ্যমে দুর্গাদেবী জীবকে পাপের ফল ভোগ করান এবং প্রতিনিয়ত দুঃখ পাওয়ার ফলে জীব এ জগৎ যে দুঃখালয় ও অশাশ্বত তা অনুভব করে। এভাবে কর্মফল ভোগের মাধ্যমে জীব ধীরে ধীরে দুঃখময় জগৎ থেকে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। তাই দেবীর এ দুঃখ দানও তাঁর কৃপা।

বদ্ধজীবের প্রতি দেবী দুর্গার দুই প্রকার কৃপাঃ ১. সকপট কৃপা ২. অকপট কৃপা। সকপট কৃপাস্বরূপ দেবী মায়ামুগ্ধ জীবদের বাঞ্ছিত ধন, জন, রূপ, যশ ও অষ্টসিদ্ধি আদি অনিত্য জড় বিষয় প্রদান করে মায়া দ্বারা মোহিত করে রাখেন। অপরপক্ষে অকপট বা নিষ্কপট কৃপাস্বরূপ তিনি জীবকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন।

এভাবে, দেবীদুর্গা মহামায়ারূপে অনিত্য জড় সুখ ও দুঃখ দানের মাধ্যমে জীবকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন এবং তিনিই যোগমায়ারূপে আমাদের এ দুর্গতি নাশ করে, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধামে ফিরে যেতে সহায়তা করেন। তাই তিনি একইসঙ্গে দুর্গতি দায়িনী এবং দুর্গতি নাশিনী। দেবী দুর্গা সম্পর্কে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে–

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

☐ মা দুর্গা কীসে সন্তুষ্ট হন?

স্বামীজিঃ আবির, তুমি কি জান, মা দুর্গা কীসে বেশি খুশি হন?

আবিরঃ না স্বামীজি। আপনি দয়া করে বলুন।

স্বামীজিঃ গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা পুষ্ট হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের

সন্তুষ্টিবিধানের মাধ্যমেই দেবীমাকে সন্তুষ্ট করা যায়। তাই, ভগবদ্ভক্তগণ শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আরাধনা করেন। তাতেই দেবীদুর্গা সন্তুষ্ট হন। তাছাড়া, বৈষ্ণবগণ প্রতিবার ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতি ও ভোগাদি নিবেদনের পর সেসকল দ্রব্য সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। এছাড়া, যোগমায়া সুভদ্রারূপে প্রতিদিনই তাঁরা দেবীদুর্গা বা কালীমাতার পূজা করেন। আবার, শ্রীমতি রাধারাণী হলেন দুর্গা আদি সমস্ত শক্তির মূল, যাঁর পূজা করা হলে সমস্ত শক্তিরই পূজা হয়ে যায়। সুতরাং, ভগবদ্ভক্তদের আলাদাভাবে অন্য কোনো দেবদেবীর পূজা করার প্রয়োজন হয় না।

তাঁরা কোনো জাগতিক লাভালাভের জন্য মায়ের আরাধনা করেন না; কেবল তাঁর সন্তুষ্টিবিধানই তাঁরা কামনা করেন। তাঁরাও মায়ের কাছে ধন, জন, যশ ও রূপের প্রার্থনা করেন। তবে তা জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য নয়। তাঁরা প্রার্থনা করেন– "হে জগজ্জননী, আমায় কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করো, আমায় কৃষ্ণভক্তজনের সঙ্গ প্রদান করো, আমায় কৃষ্ণভক্তির যশ প্রদান করো এবং চিন্ময় জগতে কৃষ্ণদাসত্বরূপ নিত্যস্বরূপ প্রদান করো।"

শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র– **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥** জপ ও কীর্তন করা। তাই দুর্গাপূজায়, এমনকি প্রতিদিন এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অথবা কীর্তন করলেই মা দুর্গা সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন।

☐ তুলসী, শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ প্রসঙ্গ

আবির: স্বামীজি। আপনার যুক্তিপূর্ণ চমৎকার আলোচনা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আরো কিছু বিষয় জানতে চাচ্ছি। বিশেষত তুলসী আদি বৃক্ষ, শালগ্রাম শিলা এবং শিবলিঙ্গ আমরা কেন পূজা করি। আমার বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে এসকল বিষয়ে প্রশ্ন করে।

স্বামীজি: আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে। তবে তোমার এসকল প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর রয়েছে। কিন্তু, ঠিক যেমন ভগবানের বিগ্রহ আরাধনার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বোঝার জন্য কাউকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ভগবানের রূপ আছে, অর্থাৎ, তিনি সাকার, তেমনি যদি কারো এটাই বিশ্বাস না হয় যে, ভগবান এজগতে মনুষ্যাদি বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে নানাবিধ লীলা করেন, তবে হাজারবার বোঝালেও তার পক্ষে তুলসী আদি পবিত্রবৃক্ষ, শালগ্রাম শিলা এবং শিবলিঙ্গ কেন পূজা করা হয়, তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন– ভগবান, তাঁর নিত্যসেবকগণ, দেবতাগণ এজগতে বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হতে পারেন কি

না? কেন ভগবান বিবিধ লীলা করেন? ইত্যাদি বিষয় তখন তুমি জানতে পারবে। এখন মূর্তিপূজা বিষয়ে যেমন তোমার সংশয় দূরীভূত হয়েছে, তেমনি তখন তুমি তাঁদের পূজা করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে; তার আগে তা সম্ভব নয়। তবুও, যেহেতু তুমি প্রশ্ন করেছ, তাই এ স্বল্প সময়ে খুব সংক্ষেপে তোমায় কেবল একটা ধারণা দিচ্ছি।

প্রথমত তুলসী কোনো সাধারণ বৃক্ষ নয়। তিনি এ জড়জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চিন্ময় গোলোকবৃন্দাবন ধামে নিত্য বাসরতা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবিকা। তবুও বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা করতে, বিশেষ কিছু ঘটনাকে নিমিত্ত করে তিনি এজগতে বৃক্ষরূপে প্রকটিত হয়েছেন। মূর্তিমান দেবী হয়েও গঙ্গা-সরস্বতী যেরূপ যুগপৎ নদীরূপে বিদ্যমান, তদ্রূপ তুলসী গোলোক নিবাসী গোপিকা হয়েও যুগপৎ বৃক্ষরূপে বিদ্যমান। তাই তাঁর পূজাকে যদি কেউ সাধারণ বৃক্ষপূজা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তা নেহাৎ অজ্ঞতা। তুলসী ভক্তিদেবী বিধায় তাঁর নিত্য পূজার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবশ্যই ভক্তি লাভ হয়। ব্যবহারিক অনুশীলন না করলে কখনোই তা কারো অনুভূত হবে না, ঠিক যেমন মধুর বোতল লেহন করলে কখনো মধুর স্বাদ পাওয়া যায় না। তাই জীবশিক্ষার নিমিত্তে ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বয়ং এ তুলসী পূজা প্রচলন করেন। তুলসী পূজা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে, যার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলো–

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতিখণ্ড, ২২ অধ্যায়) অনুসারে, একসময় দেবী তুলসী অভিমান বশত অন্তর্হিত হলে তুলসীবনে গমনপূর্বক শ্রীহরি তুলসীর পূজা ও স্তব করেন। তখন দেবী তুলসী বৃক্ষ হতে আবির্ভূতা হন এবং শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণ নেন। সেখানে এ-ও বলা হয়েছে, যে মানব হরিপ্রণীত মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিঁদুর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহার দ্বারা যথাবিধি তুলসীর পূজা করবেন, তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করবেন।

পদ্মপুরাণ: পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে (অধ্যায় ২৩) মহাদেব নারদমুনিকে সম্বোধন করে বলেন–তুলসী সম্বন্ধীয় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, শাখা, ত্বক, স্কন্ধ এবং মৃত্তিকাদি সমস্তই পবিত্র। যে গৃহে তুলসী-বৃক্ষ অবস্থিত, তার দর্শন-স্পর্শনেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে যে গৃহে, গ্রামে বা বনে তুলসী বৃক্ষ বিরাজ করে, জগৎপতি শ্রীহরি প্রীতচিত্তে সেই সেই ক্ষেত্রে বাস করেন।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ডে (অধ্যায় ৬০)– সমস্ত পত্র পুষ্প মধ্যে মঙ্গলময়ী তুলসীই সাধুতমা। তা সর্বমঙ্গলপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভুক্তিমুক্তিপ্রদা, মুখ্যা এবং সর্বলোক মধ্যে পরম শুভা। যেখানেই তুলসী বন, সেখানেই ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) এবং সেখানেই ব্রহ্মা, কমলা (লক্ষ্মী) ও অন্য সমস্ত দেব সন্নিহিত। অতএব, তুলসী দেবীকে সর্বদাই পূজা করবে।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ডে (অধ্যায় ৬১.৫-৬)– তুলসী নামোচ্চারণমাত্রই মুরারি হরি প্রীতি লাভ করেন, পাপসকল বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়ে থাকে– এমন তুলসীকে

লোকে কেন পূজা-বন্দনা করবে না?

নিত্যং যস্তুলসী দত্ত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ২১.৪৫)

"যে মানব প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা আমাকে পূজা করবেন, নিশ্চয়ই তার লক্ষ অশ্বমেধের ফল হবে।" এভাবে শাস্ত্রে তুলসীপূজার বহু মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।
নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সর্বদা তুলসীকে সামনে রেখে হরিনাম জপ করতেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর, শিব-পার্বতী, এমনকি শ্রীমতি রাধারাণী তুলসী সেবা আচরণের মাধ্যমে জীবকে তা অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং, কৃষ্ণভক্তি লাভেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিয়মিত তুলসীদেবীর আরাধনা করা।

আর শালগ্রাম শিলা স্বয়ং নারায়ণ, তাই তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। তুলসীর সঙ্গেই সম্পর্কিত একটি বিশেষ লীলার মাধ্যমে ভগবান শ্রীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা রূপে এজগতে প্রকাশিত হন। তাই শালগ্রাম অর্চনা বা পূজা করা মানে স্বয়ং নারায়ণেরই পূজা।

আর শিবলিঙ্গ বিষয়েও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এবিষয়ে তত্ত্বত কোনো জ্ঞান না থাকায় কতিপয় ব্যক্তি এর নিন্দা করে থাকে। কিন্তু কেউ তাঁর সম্পর্কে যথার্থ অবগত হলে, তখন নিন্দার পরিবর্তে তাঁর স্তুতি করবে। একদিন তোমার সঙ্গে কেবল শিব নিয়েই আলোচনা হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, শালগ্রাম শিলার ন্যায় ভগবানের গুণাবতার শিব জীবের প্রতি করুণা করে বিশেষ লীলার মধ্যদিয়ে শিবলিঙ্গরূপে জগতে প্রকটিত হন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– লিঙ্গ শব্দের আভিধানিক নানা অর্থ – চিহ্ন, প্রতীক, জননেন্দ্রিয়, সূচক, অর্থপ্রকাশক। আর শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল। তাই শিবলিঙ্গ অর্থ মঙ্গলময় প্রতীক, যাঁর দ্বারা জগতের সৃষ্টিকার্য সাধিত হয়েছে। এই প্রতীকরূপেই শিব মনুষ্যগণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহর্ষিগণের দ্বারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই পূজিত, বন্দিত। কিন্তু অধুনা মানুষের চেতনা কলুষিত হওয়ার ফলে মানুষ এই প্রতীকরূপে শিবের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মায়ার সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতাররূপে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু মায়াদেবীর প্রতি ইক্ষণ বা দৃষ্টিপাত করেন। ভগবানের ইক্ষণের ফলে সৃষ্ট দিব্য জ্যোতির্ময় প্রকাশ প্রকৃতিরূপা মায়ার গর্ভে সমস্ত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহের উপাদান সঞ্চার করেন। এ জ্যোতির্ময় স্বরূপই শিবলিঙ্গরূপে পরিচিত।

এবার বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে কতগুলো বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

পূর্বে বলা হয়েছে– লিঙ্গ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে প্রতীক। তাই সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গকে জননেন্দ্রিয় বলে বিচার করা ঠিক নয়। যেমন, আমরা যখন ব্যকরণে লিঙ্গান্তর করি, তখন বিকল্প থাকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ, 'শিক্ষক' পুংলিঙ্গ আর 'শিক্ষিকা' স্ত্রীলিঙ্গ। এক্ষেত্রে কি আমরা 'শিক্ষক' পুংলিঙ্গ বলতে শিক্ষকের লিঙ্গকে বুঝাচ্ছি, নাকি প্রতীক বা ধরণ অনুসারে তাঁর শ্রেণিবিভাগ করছি?

আবার, কোনো দেশকে মাতৃস্বরূপা মনে করে স্ত্রীলিঙ্গের আওতাভুক্ত করা, তাঁর অর্থ কি এই যে বাংলাদেশের স্ত্রীলিঙ্গ বলতে বাংলাদেশের জননেন্দ্রিয়কে বোঝানো হচ্ছে। এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন বন-বনানী, অরণ্য-অরণ্যানী ইত্যাদি। এখানে কেবল একটি রূপ বা প্রতীকরূপে একে লিঙ্গ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সকল ক্ষেত্রেই আমরা লিঙ্গ বলতে জননেন্দ্রিয় বুঝি না, কারণ, লিঙ্গের বহু অর্থের মধ্যে জননেন্দ্রিয় তার কেবল একটি অর্থ। সেজন্য শিবলিঙ্গ বলতে শিবের জননেন্দ্রিয়- এ কথাটি যুক্তির বিচারেও ভিত্তিহীন।

আবার, যদি লিঙ্গ শব্দে জননেন্দ্রিয়ও বোঝায়, তবুও তা নিন্দার্হ কি না তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যাক–

আমাদের জন্মের কথা ধরা যাক। পিতামাতার আনন্দঘন মুহূর্তের ফলেই আমাদের উৎপত্তি। কিন্তু যে কারণে আমাদের জন্ম হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা চর্চা করি না বা তাকে ঘৃণাও করি না। বরং, সেই কারণেই আমরা পিতাকে জন্মদাতা বলে সবচেয়ে মর্যাদা দান করে থাকি। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার নিন্দা করবে না।

ঠিক তেমনি ভগবান শিবরূপী তাঁর লিঙ্গ বা জ্যোতির দ্বারা প্রকৃতিস্বরূপা মায়াদেবীর গর্ভে এ ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভাধান করেন, যার মাধ্যমে এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হলো। তবে, আমাদের সৃষ্টির কারণস্বরূপা যে লিঙ্গ, তাঁকে কি আমাদের প্রাকৃত বা জড় দৃষ্টিতে দেখা উচিত, নাকি অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শনপূর্বক এর অর্চন করা উচিত?

তাই লিঙ্গ শব্দের দুটি অর্থ বিশ্লেষণ করেই দেখা গেল যে, শিবলিঙ্গ প্রাকৃত কোনো বিষয় নয়; বরং জগৎ সৃষ্টির কারণ। তাই তা পরম শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করার বিষয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি প্রাকৃত বিধায় আমরা সবকিছুকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করি। অজ্ঞাতাবশতও আমাদের এ ধরনের অপরাধ যেন না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং যেসকল মূঢ় শিবলিঙ্গের যথার্থ মর্ম না জেনে তাঁর নিন্দা করে, তাঁদের এ তত্ত্ব অবগত করানো উচিত।

আবিরঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্বামীজি। আপনার আলোচনায় আমার অনেক সংশয়ের অবসান হলো। তবে আরো কিছু বিষয় এখনো আমার জানা দরকার। যেমন: কৃষ্ণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি, শিব সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত, জন্মান্তর ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

স্বামীজি: আশা করি এ বিষয়গুলোরও যুক্তিযুক্ত সমাধান তুমি পাবে। আমার সন্ধ্যাকালীন গায়ত্রীর সময় হয়ে গেছে। আবার দেখা হবে। হরেকৃষ্ণ।

[আবির বর্তমান তরুণ হিন্দু প্রজন্মের প্রতিভূ, যারা শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় কিছু মানুষের বাগাড়ম্বরের ফাঁদে পড়ে অসত্যকে সত্য বলে মনে করে বিভ্রান্তির পথে পা বাড়াচ্ছে; এমনকি ধর্মান্তরিত হতেও দ্বিধা বোধ করছে না। তাই ইন্টারনেট ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর কিছু প্রশ্নের উত্তর এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি তা মানুষের বিভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক হবে।]

– হরেকৃষ্ণ –

গ্রন্থটি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য বা পরামর্শ থাকলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হলো–

arsandhane@gmail.com

(আপনার মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে)